দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৩ □ জুলাই ২০১৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনায় বাজারি ... ... স্মরজিৎ জানা...১
সংগ্রহ : এনভায়রনMEND ... পৌলোমী দাস চট্টোপাধ্যায়...৪
প্রচ্ছদ নিবন্ধ : খাদ্য সুরক্ষা
খাদ্য সুরক্ষা বিলের ঢক্কানিনাদ...এক 'খুড়োর কল'... স্বপন গাঙ্গুলী ... ৫
বিশেষ নিবন্ধ : প্রাকৃতিক খাবার
খাদ্য তালিকায় ফুল ... অনুপম পাল... ৯
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের শিল্প
রাজনীতির কোপে শিল্প ... সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ... ১১
বিশেষ নিবন্ধ : নারী ও বৈধব্য
বৈধব্যের বিচারে সমাজ ও আইন ... প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : নারী ও ধর্ষণ
পুরাণকাল থেকে আজ ধর্ষণ রাজনৈতিক ... চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য ... ১৯
বিশেষ নিবন্ধ : নারী ও অধিকার
নারী নির্যাতন : সাম্প্রতিক প্রেক্ষিতে ... শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী ... ২২
বিশেষ নিবন্ধ : দৈনন্দিন বিজ্ঞান
গরমে ঠান্ডা থাকা ... জে বি এস হলডেন ... ২৭
অসুখ - বিসুখ রোগ - বালাই
সাপের কামড় ... পুণ্যব্রত গুণ ... ২৯
ডাকের চিঠি : কামদুনি : গণধর্ষণ, শাসক সম্প্রদায় ... ৩১

ছবি ঋণ স্বীকার : কল্যাণ রুদ্র।
প্রচ্ছদ : তরুণ বসু

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.3 □ July 2013
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006 WB INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777 e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনায় বাজারি অর্থনীতির ভূমিকা

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'— এদেশের সব মায়েরই মনের কোণে সম্ভবত জড়িয়ে রয়েছে এই আকুতি। বিশেষত যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়— সেই সেব পরিবারের মায়েদের তো বটেই, এমনকি এদেশের নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তদের পরিবারেও শোনা যাবে একই ধরণের আর্তি। আর শতকরা হিসেবে এরাই হলেন এ দেশের সব থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ। পরিসংখ্যান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক থাকলেও কম করেও এদেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষ যারা দারিদ্র্য-সীমার (এই সীমারেখা টানা নিয়েও অনেক দড়ি টানাটানি হয় এবং হচ্ছে) নীচে রয়েছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর এই সব মানুষদের পেট ভরানোর দায়দায়িত্ব সরকারের থাকলেও ইতিপূর্বে অনেক সরকারই এ নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর করলেও সত্যিকারের কোনো সদর্থক নীতি ও সেই নীতি মেনে গরিব মানুষদের পেট ভরানোর বিধি ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। স্বাধীনতার পয়ষট্টি বছর পর এবং অনেক দেরিতে হলেও আজ যে আলোচনা চলছে, খাদ্য সুরক্ষা বিল প্রণয়নের কাজে যে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাকে সাধুবাদ জানাতে হবে। তবে এর মাধ্যমে গরিব খেটে খাওয়া মানুষরা সারা বছর দু'বেলা যাতে খেতে পারে তার বন্দোবস্ত সত্যিই কতটা সম্ভব ও কার্যকর হবে সেটা বোঝা দরকার।

পরিবারে খাদ্যের সুরক্ষা বজায় রাখতে দেশের খাদ্য সুরক্ষার বিধি বন্দোবস্ত গড়ে তোলার দরকার এ নিয়ে বিতর্ক নেই তবে দেশের খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টার পরিধি অনেক বড়ো। দেশের 'খাদ্য সুরক্ষা'-র ব্যবস্থা মূলত চারটে বিষয়কে ঘিরে গড়ে তোলা হয়। প্রথম তিনটে হলো খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বণ্টন ব্যবস্থা, যা আমরা সবাই কমবেশি জানি। দেশের সব মানুষদের খাওয়াতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনের যে প্রয়োজন রয়েছে তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। চাল, ডাল, তেল, চিনি ইত্যাদি খাদ্যবস্তু সরকার উৎপাদন করেন না ঠিকই, তবে উৎপাদনের 'উপযোগী পরিবেশ' তৈরি করার দায়দায়িত্ব তার। সরকার বিভিন্ন নিয়মনীতি, অর্থনৈতিক সাহায্য ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে জল, বিদ্যুৎ, সার, কীটনাশক এবং সর্বোপরি উৎপাদক অর্থাৎ চাষিদের ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি— সবই কিন্তু সরকারই নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকার কখনও ওই সব জিনিসে ভতুর্কি দেওয়ার মাধ্যমে কখনও-বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরাসরি খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী যেমন ফসলের বীজ, সার ইত্যাদি কমমূল্যে চাষিদের হাতে তুলে দেন। খেয়াল করলে দেখবেন এই সমস্ত ধরণের সরকারি কাজকর্ম কার্যতপক্ষে দেশের বাজারে (অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে) সরকারের ঢোকা এবং সেখানে পরিবর্তনের ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে। তাই এই সব আইন, প্রকল্প, ভতুর্কি ইত্যাদি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি প্রচেষ্টার অঙ্গ। এখানে এই বিষয়টি উত্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করছি এ-কথা বোঝাতে যে খাদ্য সুরক্ষার জন্য যে কোনো সরকারি ব্যবস্থাপনা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ না করে সঠিক ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তা সে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বণ্টন সর্বক্ষেত্রেই এ কথা সমান প্রযোজ্য। তাই খাদ্য সুরক্ষার চতুর্থ আঙ্গিকটি হলো এই 'বাজার'। সরকার কোথায়, কিভাবে এবং কতটা সাফল্যের সঙ্গে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে তার উপর নির্ভর করছে দেশের 'খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা' কতটা জনমুখী হতে পারবে কি পারবে না সেই বিষয়টা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিষয়ে যারা অবগত আছেন তারা নিশ্চয়ই জানবেন ওই দুর্ভিক্ষে এই দেশে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। গবেষক এবং সমীক্ষকেরা তার প্রধান কারণ হিসেবে 'অনিয়ন্ত্রিত বাজারকে' প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রিটিশ রাজত্বে পরাধীন দেশের মানুষজনদের জন্য সরকারি প্রচেষ্টায় খাদ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না, বণ্টন তো তারও পরের কথা। ফলে ওই সময় ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে খাদ্যের মূল্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অভুক্ত রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। স্বাধীন দেশের সরকার তাই বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করেন, যাতে ওই ধরণের অবস্থা তৈরি না হয়। তাই খাদ্যপণ্যের সংগ্রহ মূল্য বেঁধে দেওয়া এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় তা গুদামজাত করার প্রক্রিয়া খাদ্য সুরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য সংগ্রহ ও গুদামজাত করার সরকারি ব্যবস্থাপনা কিছুটা সরাসরি আর কিছুটা পরোক্ষে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রেও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা এবারের প্রস্তাবিত খাদ্য বিলের আলোচনায় ঢুকলে বোধগম্য হবে।

প্রস্তাবিত বিলে বলা হচ্ছে এদেশের চালু এবং প্রায় ভেঙে পড়া রেশন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তার জায়গায় গরিব মানুষদের সরাসরি বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য সরকারি দামে কিনে নেওয়ার সুযোগ গড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া হবে 'স্মার্ট কার্ড'। তারা ওই কার্ড ব্যবহার করে প্রতি মাসে সরকার নির্ধারিত দামে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের চাল, গম ইত্যাদি বাজার থেকে কিনতে পারবেন। সরকার ভতুর্কির টাকা তার কোষাগার থেকে ব্যবসায়ীদের দিয়ে দেবেন। এতে রেশনকে ঘিরে যে দুর্নীতির আখড়া গড়ে উঠেছে সারা দেশে, যার মাধ্যমে নানান ভাবে গরিব ক্রেতারা হেনস্থা হন এবং হচ্ছেন সেটা বন্ধ হবে। নিজের প্রয়োজন ও সময়মতো খাদ্যদ্রব্য খোলা বাজার থেকে কিনতে গরিব মানুষদের কোনো ধরণের ঝক্কি পোয়াতে হবে না। বামপন্থী সহ অনেকেই এখন অবশ্য বলছেন খাদ্য সুরক্ষা দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য লাগু করতে হবে এবং তা করতে হবে দেশের চালু গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে। অথচ তারা এ রাজ্যে বিগত চৌত্রিশ বছরে এই ব্যবস্থাকে উন্নীত করা তো দূরের কথা, এই ব্যবস্থাপনা তিলে তিলে ভেঙে পড়তে দেখেও তাকে উন্নীত করতে সেদিন কোনো উৎসাহ দেখাননি। এমনকি আমজনতা যখন রেশন দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তখনও তারা মুখ ঘুরিয়েই থেকেছিলেন। ফলে এই গণবণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমতও গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। এছাড়া রেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরও যে সব যুক্তি রয়েছে তা হলো এই রেশন ব্যবস্থাপনা চালু রাখাই এক খরচ সাপেক্ষ বিষয়, অনেকটা হাতি পোষার মতো। রেশনের মাধ্যমে এক টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে খরচ হয় প্রায় দেড় টাকারও বেশি। এছাড়া অন্যান্য অব্যবস্থা তো রয়েছেই। যার বিরুদ্ধে এই রাজ্যেও ২০০৯ সালে প্রায় এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ গড়ে উঠেছিল বহু জেলায়, গ্রামে ও গঞ্জে। বস্তুতপক্ষে কেরল ছাড়া ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই গণবণ্টন ব্যবস্থার এখন বেহাল অবস্থা। ছত্তীসগঢ়ে খুব সম্প্রতি কিছু সদর্থক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। রেশন মালিকের চুরি, কারচুপি, পেছনের দরজা দিয়ে খোলাবাজারে খাদ্যবস্তু পাচার করা ইত্যাদি সহ আরও বহু ধরণের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এই গণবণ্টন ব্যবস্থাপনায়। ফলে নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে আমজনতার কাছে 'স্মার্ট কার্ড'-এর আবেদন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

তবে রেশন সম্পর্কিত আলোচনা শুধুমাত্র বণ্টনের ইস্যুতে বেঁধে রাখলে চটজলদি যে সিদ্ধান্তে প্রায় সবাই পৌঁছুবেন তা হলো এই অর্কমণ্য ব্যবস্থাপনা ভেঙে দিয়ে বরং সরাসরি ক্রেতারা যাতে বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা ও সুযোগ গড়ে দেওয়া হোক। এই সব আলোচনায় যে বিষয়টি আমাদের অনেকেরই নজর এড়িয়ে চলে যায় তা হলো সেই 'বাজার' এবং 'বাজারকে' নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো। দেশের খাদ্য সুরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা অটুট রাখতে এটা যে কত জরুরি তা আমরা খেয়াল করি না। ধরে নেওয়া যায় এই বিলের মাধ্যমে দেশে স্মার্ট কার্ড চালু হবে এবং হয়তো দেশের অধিকাংশ মানুষের হাতে তা পৌঁছেও দেওয়া যাবে। কিন্তু তাতে খাদ্য সুরক্ষা কি সত্যিই গড়ে তোলা যাবে? অনেকেই আজ অনুমান করছেন, এর ফলে যে কাণ্ডটি ঘটবে তার ফল হবে বেশ মারাত্মক। বাজার ক্রমশ সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে চলে যাবে এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই লাগামছাড়া বাজারে ব্যবসাদাররা পণ্যের দাম তাদের মতো করে বাড়িয়ে দেবেন। অনেকে হয়তো বলবেন তাতে ক্রেতার কি এসে যায়, তিনি তো সরকার নির্ধারিত মাত্রায় চাল, ডাল বা দানাশস্য (গরিবরা মাথাপিছু সাত কিলো এবং মধ্যবিত্তরা পাঁচ কিলো) নির্ধারিত দামে বাজার থেকে কিনতে পারছেন। চাপ পড়বে দেশের

কোষাগারে এবং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সরকারকে অতিরিক্ত হারে টাকা গুণতে হবে ব্যবসাদারদের এবং এর ফলে সরকারের বেঁধে দেওয়া বাজেটে আর কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। আমাদের দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা প্রকারান্তরে খাদ্যদ্রব্যের বাজারে যে কমবেশি নিয়ন্ত্রণ আনতে সমর্থ ছিল তা নিমেষে উধাও হয়ে যাবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত এই ব্যবস্থাপনা সঠিক ভাবে পরিচালিত হলে দেশের অধিকাংশ মানুষ খাদ্যদ্রব্য ন্যায্য দরে পেতে পারতেন। দেশের গণবণ্টন ব্যবস্থা তুলে দিলে খোলা বাজার কি চরিত্র নেবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। আসলে যে কোনো দেশের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা খোলা বাজার ও বাজারি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণে না রেখে ভাবা সম্ভব নয় এবং প্রকৃতপক্ষে বাজারের হাল হকিকৎ শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিলে সরকারি খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা অচিরেই ভেঙে পড়বে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে তা হলো খাদ্য সুরক্ষা শুধুমাত্র গরিব মানুষদের জন্য হবে, নাকি দেশের সমস্ত মানুষজনদের জন্যই লাগু করতে হবে? কেন সবার জন্য খাদ্য সুরক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়টি সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। এক পক্ষের যুক্তি হলো, সবার জন্য তা না করলে দুনীর্তিতে ভরা এই দেশে বিত্তবানেরা এই সুযোগ হাতিয়ে নেবেন। যেমনটা ঘটেছে অন্য সব ক্ষেত্রেও। ফলে সবার শেষে পড়ে থাকবে গরিব মানুষেরা যেমনটা ঘটেছে বিপিএল কার্ড (দারিদ্র্যসীমার নীচের ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত) সহ বহু সরকারি অনুদান ও পরিষেবা ইত্যাদিতে গরিবেরা পিছু হটছেন। কারণ এই সব সুযোগ-সুবিধার একটা বড়ো অংশ বিত্তবানেরা নিজেদের কোলে টেনে নিয়ে তার ঝোল খাচ্ছেন। তেমনটা আবার ঘটবে খাদ্য সুরক্ষা বিধি ব্যবস্থায় তাই তারা খাদ্য সুরক্ষা বিলে জন সাধারণের শ্রেণি বিভাজনের বিরুদ্ধে। এই যুক্তির 'সারবত্তা' এবং এর 'সীমাবদ্ধতা' দুনীর্তি ভরা রেশন ব্যবস্থার বিপক্ষের মানুষজনদের বক্তব্যের সঙ্গে একই ভাবে মিলে যায়। প্রশ্ন হলো, দুনীর্তি রয়েছে বলে কিংবা দুনীর্তি দেখা দিতে পারে এই যুক্তিতে ভর করে দেশের কোনো নীতি তৈরি করা সম্ভব, না তা করা উচিত? দুনীর্তি কিভাবে রোখা যায় কী ভাবে এই ব্যবস্থাপনায় সাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাপনা জোরদার করা যাবে সে কথা কেউ বলছেন না কেন! খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার নীতি প্রণয়নে তথা তার নিয়ন্ত্রণে গরিব, শ্রমজীবী মানুষদের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর অংশগ্রহণ কি ভাবে সুনিশ্চিত করা যায়— সেটা ডান, বাম কারওরই আলোচনার বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, দুনীতির অজুহাতে দেশের সব মানুষের জন্য খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত লাগু করতে হবে— এমন যুক্তিও মানা যায় না। অবশ্য অনেকেই হয়তো বলবেন দেশের সমস্ত নাগারিকদের জন্য অর্থাৎ দেশের সব মানুষের প্রতি সরকারের ন্যূনতম কিছু দায়দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষত আমাদের দেশের সংবিধান মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিকের বাঁচার অধিকার রয়েছে। যার দায়িত্ব সরকার নিতে বাধ্য। আর খাদ্য ছাড়া মানুষ কি করেই বা বেঁচে থাকবে? তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তাই খাদ্য সুরক্ষার বিধি ব্যবস্থা সবার জন্য থাকা দরকার। সাধারণ বিচারে বিষয়টি যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহ নেই। তবে গুরুত্বের বিচারে তার জন্য যদি দেশের দরিদ্রতম মানুষগুলোকে অভুক্ত থাকতে হয় তাহলে সেটা তো মেনে নেওয়া যায় না। খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনায় সব থেকে পিছিয়ে থাকা মানুষদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথমত সরকারি খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার নীতি-নির্ধারণে তাদেরকে কী ভাবে আনা যাবে, ব্যবস্থাপনার উপর গরিব মানুষদের সত্যিকারের মালিকানা কী ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেটাই প্রধান ও মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসা দরকার। এরপর অন্য কথা।

স্মরজিৎ জানা

একটি বিশেষ ঘোষণা

মে ২-১৩-য় দুর্বার ভাবনা পাঁচ বছরে পা দিল। অনেক অসুবিধার মধ্যেও আমরা চার বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা পত্রিকা প্রকাশ করে এসেছি। নিয়মিত গ্রাহক-পাঠকদের হাতে পত্রিকা তুলে দিয়ে এসেছি, এবং একই দামে। কিন্তু ঘটনা এই যে, গত চার বছরে ছাপার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বিপুল হারে বেড়েছে। এবার আমরা নিরুপায়। তাই বাধ্য হচ্ছি আগামী অগাস্ট ২০১৩ থেকে পত্রিকার দাম পাঁচ (৫.০০) টাকা বাড়াতে। অর্থাৎ আগামী সংখ্যা দুর্বার ভাবনার দাম হবে পনেরো (১৫.০০) টাকা। অগাস্ট ২০১৩ থেকে যাঁরা গ্রাহক হবেন তাদের বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হবে একশত পঞ্চাশ টাকা (যারা সরাসরি অফিস থেকে সংগ্রহ করবেন) এবং ডাক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে দুইশত (২০০.০০) টাকা। ইতিমধ্যেই যারা গ্রাহক আছেন তাঁদের কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হবে না কিন্তু গ্রাহক পদ নবীকরণের সময় নতুন হারে গ্রাহক চাঁদা দিতে হবে।

সম্পাদক

দুর্বার ভাবনা

এনভায়রনMEND

পৌলোমী দাস চট্টোপাধ্যায়

লাঞ্চটাইমে বাড়ি থেকে যত্ন করে ব্যাগে পুরে দেওয়া টিফিন বক্স-এর ঢাকনা খুলেই যদি দেখা যায়, ভিতরে জুতোর সুখতলা মাফিক ক-খানা রুটি আর পৃথিবীর সবচাইতে বোরিং একটা তরকারি জুল জুল করে তাকিয়ে আছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কি করতে ইচ্ছে করে? বলতে পারলে গড় নম্বর বাঁধা। কারণ সব উত্তরই এক হবে—ডাস্টবিনে পুরো জিনিসটার জলাঞ্জলি। কিন্তু টিফিন বক্সের বিরক্তিকর লাঞ্চ অপশন যদি বদলেও যায়, তা হলেও কি পুরোটার সদ্ব্যবহার হয়? নাকি, অর্ধেক খাওয়ার পরেই আশপাশের টিফিন বক্সগুলো চুম্বক-টানে তাদের দিকে টেনে আনে? মোদ্দা কথা, প্রত্যেক দিন যদি কেউ সোনামুখে বাড়ির টিফিন সবটা খেয়ে নেয়, সে জিনিয়াস। সে কখ্খনও ক্লাসে প্রক্সি দেয় না, ভুলেও মেয়েদের দিকে চোখ তুলে চায় না, অঙ্কের টিচারকে পেটব্যথার গপ্পো শোনায় না। স্মার্ট ছেলে মেয়েরা ওসব করে নাকি? ছোঃ।

আহা একমিনিট দাঁড়াও। তুমি এইমাত্র যে তরকারিটা ফেলে দিলে, সেটা তো গেলই, সঙ্গে আর কী কী নষ্ট হলো একবার শুনে নাও। এই তরকারিটা বানাতে যে যে সবজি দরকার হয়েছে, যত মশলা, জল লেগেছে, গ্যাস খরচ হয়েছে সবেরই তো পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। তারপর সবজিগুলো ফলাতে যে যে সার লেগেছে যন্ত্রপাতি চলেছে, সেচের জল দরকার হয়েছে, মশলা প্রসেসিং-এর যাবতীয় উপকরণ— সব বেকার। তাই তুমি যাকে ওইটুকুনি তরকারি ভাবছ, তার ক্ষতিটা হিসেব করতে বসলে দেখবে কুল-কিনারা পাচ্ছ না। এবার ভাবো, প্রতিদিন আমরা যে খানিকটা করে খাবার নষ্ট করছি, সেগুলো সব জুড়ে কত বড়ো ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশের! তাই, 'ভাবো, খাও এবং বাঁচাও'। খাওয়ার আগে একটু ভাবো এবং পরিবেশ বাঁচাতে সাহায্য করো— এটাই ছিল এ বছরের পরিবেশ দিবসের থিম।

আমাদের পৃথিবী তার এই সাতশো কোটি সন্তানকে লালন-পালন করার জন্য যথেষ্ট সম্পদ জুগিয়ে যায়। কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তার এক-তৃতীয়াংশই যদি জঞ্জালের মধ্যে ঠাঁই পায়, তাহলে চলবে কী করে? খাদ্য অপচয় যে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের দফারফা করে ছাড়ছে, তা নয়, পরিবেশের ওপরেও সাংঘাতিক প্রভাব ফেলছে। একদিকে খাদ্য-সংকট, অন্যদিকে পরিবেশ-দূষণ— দু'দিক থেকেই চলছে সাঁড়াশি আক্রমণ। মাঝে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত কোটি কোটি মানুষের। নিজেদের ভুলের খেসারত দিচ্ছে রোজ। রাষ্ট্রপুঞ্জের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অরগানাইজেশন (FAO) একটা হিসেব দিয়েছে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে ১.৩ বিলিয়ন টন খাবার নষ্ট হয়। পরিমাণটা গোটা সাবসাহারান আফ্রিকায় যে পরিমাণ খাবার উৎপাদন করা হয়, তার সমান। বিশ্বে প্রতি সাত জন মানুষের মধ্যে একজন পেটে খিদে নিয়ে ঘুমোতে যায়। আর প্রতিদিন ২০ হাজারেরও বেশি পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু স্রেফ খাবারের অভাবে মারা যায়। এরপরেও ভাববে না?

এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আয়োজক ছিল মঙ্গোলিয়া। বিশ্বে যে কটি দেশ খুব দ্রুত উন্নতি করছে, মঙ্গোলিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। এদেশে কিন্তু খুব বেশি খাবার নষ্ট হয় না। তার ওপর এদেশের প্রাচীন যাযাবর জবীনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষেরা অনেক দিন পর্যন্ত খাবারদাবার তাজা রাখতে নানা উপায় বের করেছিল। সে সব প্রাচীন কায়দাকেতা-কে বুড়ো আঙুল না দেখিয়ে আধুনিক খাদ্য সংকটের মোকাবিলায় তাকেই হাতিয়ার বানিয়েছে মঙ্গোলিয়া। শুধু মঙ্গোলিয়াই বা কেন, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে অনেকদিন অবধি খাবার ঠিক রাখার টোটকা বিভিন্ন দেশেই ছিল। তখন কোথায় ফ্রিজ, কোথায়ই বা কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ!

আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা বিস্তর খেটেখুটে সহজ সরল পদ্ধতিতে খাবার বাঁচাতেন, বেঁচে যাওয়া খাবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতেন। খুব দরকার না পড়লে খাবার ফেলে দেওয়ার কথা শুনলেই কানে আঙুল দিতেন তাঁরা। আগের রাতের বেঁচে যাওয়া ভাতে জল ঢেলে সারারাত রেখে দেওয়া হতো। 'পান্তাভাত'। সকালে অল্প একটু লেবুর রস, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মেখে তোফা একখানা জলখাবার। বাসি রুটিকে ভালো করে ঘি দিয়ে কুড়মুড়ে করে ভেজে চায়ের সঙ্গে খাওয়া হতো। খেয়ে দেখো, শুকনো বিস্কুটের চেয়ে ঢের বেশি সুস্বাদু। তারপর ধরো, বড়ি দেওয়া। ডাল বেটে বড়ি দেওয়া, তাকে শুকোনো, মাঝেমধ্যে রোদে দেওয়া, কাক তাড়ানো— হ্যাপা খুব। কিন্তু সামনের মাসগুলোয় নিরামিষ তরকারি কী দিয়ে রাঁধব, ভেবে মাথা চুলকোতে হতো না। বেঁচে যাওয়া দুধ জ্বাল দিয়ে বানানো ক্ষীর, সবজি বা ফল দিয়ে আচার করা, জ্যাম বানানো— এ সবই কিন্তু ভবিষ্যৎ-সঞ্চয়ের জন্য। ভাত খাওয়ার পর শীতের মিঠে রোদে পা ছড়িয়ে এ জিনিস চুরি করে যে খায়নি, সে কোনো দিনও বুঝবে না কী হারিয়েছে। আমরা খেয়েছি, কিন্তু পিছনের যুক্তিটা ভেবে দেখিনি।

বাটা মশলায় খানিকটা হলুদ মিশিয়ে দু'দিন রেখে দেওয়া, কাটা সবজির টুকরোয় তেল মাখিয়ে রাখা— এ সব দেশীয় সংরক্ষণ পদ্ধতিকে পাত্তাই দিইনি। এখন দিতে হচ্ছে। কারণটা খুব সহজ। অত্যধিক প্রিজারভেটিভ-এর ব্যবহার মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। এই জন্যই ইউনাইটেড নেশন্স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) তার ওয়েবসাইটে বিভিন্ন দেশে খাবার সংরক্ষণের প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতিগুলির উদাহরণ দিয়েছে। দেখা গিয়েছে, খাবার বাঁচানোর এই সমস্ত দেশীয় পদ্ধতিই

এরপর ৮ পাতায় ➔

খাদ্য সুরক্ষা বিলের ঢক্কানিনাদ আসলে এক 'খুড়োর কল'

স্বপন গাঙ্গুলী

খাদ্য সুরক্ষা বা খাদ্য নিরাপত্তার সাথে যে সমস্যাটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত তা হলো : অনাহার, অর্ধাহার। দেশে বুভুক্ষু মানুষের উপস্থিতি থাকলেই 'খাদ্য সুরক্ষা'র প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই, দেশের ক্ষুধার চিত্রটি এক ঝলকে দেখা যাক। দেশের শতকরা ৪৩ জন শিশু অপুষ্টির শিকার, ৪০ শতাংশ মহিলা যারা আগামী প্রজন্ম গড়ার কারিগর ভোগে রক্তাল্পতায়। দেশের কোণে কোণে, শহরে গ্রামে এখনও অনাহারে, অর্ধাহারে মৃত্যুর মিছিল।

ক্ষুধা মাপার সূচকে ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতে ক্ষুধার জ্বালা বেড়েই চলেছে এবং ক্ষুধার সূচক ২২.৯ থেকে বেড়ে ২৩.৭ এ পৌঁছেছে। অথচ, একই সময়ে পাকিস্তান, নেপাল, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, মায়ানমার, উগান্ডা, জিম্বাবোয়ে, মালাওয়াই সহ ৮১টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে প্রত্যেকেই তাদের অবস্থার উন্নতি করেছে এবং ক্ষুধার জ্বালা কমাতে সমর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে, গত বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাকে নায়কের আসন দিয়েছে। এই একই সময়ে দেশের খাদ্য মজুতের পরিমাণ ১০ কোটি মেট্রিক টন অতিক্রম করেছে। একদিকে আমরা উন্নত দেশে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে আমাদের খাদ্যশস্য বিদেশে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করছি অন্যদিকে দেশের মধ্যে আমাদের নিজেদের মানুষকে অভুক্ত রেখে, অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

আসলে, স্বাধীনতার পর তথাকথিত উন্নয়নের সুফল দেশের সব শ্রেণির মানুষের কাছে সমান ভাবে পৌঁছোয় নি। আর তা হয়নি বলেই মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির মানুষের কাছে উন্নয়ন মানে আরও বৈভব, আরও বিলাসিতা। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের কাছে উন্নয়ন মানে বেকারি, উচ্ছেদ, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অর্ধাহার আর অনাহার। ১৯০ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে একটা জাতি স্বাধীন হলো। স্বাধীন দেশে খেটে খাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খাতায় কলমে বেঁচে থাকার অধিকার ছাড়া পেল কেবলমাত্র একরাশ বঞ্চনা। তাই, স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও এখনও দেশের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। অথচ দেশে খাদ্য উদ্বৃত্ত। প্রতি বছর সরকারি গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হয়। একদিকে গুদাম ভর্তি খাবার উপচে পড়ছে আর অন্যদিকে ভুখা পেটে কোটি কোটি মানুষ একমুঠো খাবারের জন্য হা-পিত্যেশ করছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তাই, এই খাদ্য সুরক্ষার অর্থ 'ভর্তি গুদাম, ভুখা পেট'।

প্রশ্ন হলো, যে দেশে বাঁচার অধিকার বা জীবনের অধিকার সংবিধান (অনুচ্ছেদ ২১) প্রদত্ত, যে দেশে খাদ্যের কোনো অভাব নেই, সেই দেশে অনাহারে, অর্ধাহারে লোক মরবে কেন? এই প্রশ্নেই মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে ২০০১ সালে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (পিইউসিএল) রাজস্থান শাখা। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অনেক অন্তর্বর্তীকালীন রায় দিয়েছেন— যা প্রকারান্তরে দেশের সংবিধান অনুযায়ী আইনের সামিল। এই রায়গুলির ফলে দেশের লোক সীমিত ভাবে হলেও কিঞ্চিৎ 'খাদ্য অধিকার' লাভে সমর্থ। তাই দেশে সরকার যদি খাদ্য সুরক্ষা দিতে কোনো আইন করতে চায় তবে সেই আইনে বর্ণিত খাদ্য অধিকার বর্তমানে কোর্টের রায়ের সুবাদে প্রাপ্য অধিকার থেকে উন্নত হবে এটাই আশা করা যায়। প্রকৃত অর্থে কিন্তু, প্রস্তাবিত সরকারি বিল পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আসলে খাদ্য নিরাপত্তার নামে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে এড়িয়ে গিয়ে মানুষের ইতিমধ্যে প্রাপ্ত অধিকারকে হরণ করার খেলায় মেতেছে।

এই প্রেক্ষিতেই দেশের বহুল চর্চিত খাদ্য সুরক্ষা বিলটি নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই বিলটি প্রণয়ন করার ব্যাপারে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের ভূমিকা নিয়ে দু-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত। 'মরণকালে হরিবোলে'র মতোই দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার তার অন্তিম লগ্নে দেশের মানুষের মঙ্গল কামনায় (!) খাদ্য সুরক্ষা বিল নিয়ে অর্ডিনান্স জারি করবে কিনা তা নিয়ে তুমুল শোরগোল তুলে দিল। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীসভায় আলোচনার পর অবশেষে বিলটি নিয়ে অর্ডিনান্স জারির পথ থেকে সরকার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে সরে আসতে বাধ্য হলো। প্রশ্ন হলো, খাদ্য নিরাপত্তা বিল নিয়ে এ হেন অবস্থা হলো কেন? দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার দ্বিতীয়বার মসনদ দখল করার প্রাক্কালে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে ১০০ দিনের মধ্যে খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করবে। যে আইন ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে সংসদে পাশ

করার কথা সেই আইন সরকারের অন্তিম লগ্নে সাড়ে চার বছর পর কেন পেশ করা হলো তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আবার যদিও-বা পেশ করা হলো তাও আবার এমন হেলাফেলা করে পেশ করা হলো কেন?

শাসক দলের বিভিন্ন দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে সংসদ যখন প্রায় অচল অবস্থায় তখন তড়িঘড়ি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল যার সাথে ১২৭ কোটি মানুষের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষের স্বার্থ জড়িত, তা পেশ করে সরকার কি মানুষের খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছার মনোভাব প্রকাশ করল না কি মানুষের ক্ষুধাকে পুঁজি করে ঘৃণ্য সংকীর্ণ রাজনীতিতে নিমগ্ন হলো। বিরোধীদের প্রতিবাদ মুখর সংসদে সরকার পক্ষ যখন ভীষণ রকম কোণঠাসা তখন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বিলটি সংসদে তড়িঘড়ি নাম-কা-ওয়াস্তে পেশ করলেন এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক গতিতেই বিরোধীরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করলেন। বিলটি পাশ হলো না, হওয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল না। আর ভোটের বাজার গরম রাখতে সরকার ও বিরোধী পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করার প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। নিট ফল, অর্ধাহারে-অনাহারে থাকা দেশের নাগরিকদের একটি বৃহত্তম অংশ চূড়ান্ত ভাবে বঞ্চিত হলো। দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের সাথে এ এক চরম রসিকতা।

আইন পাশ করার নামে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এমন ছেলেখেলা সত্যিই ক্ষমার অযোগ্য। অন্যদিকে, বর্তমান মোড়কে শতছিদ্র বিলটি যদি পাশ হতো তবে হলফ করে বলা যায়, তা দেশের কোটি কোটি মানুষের 'ক্ষুধা'-র নিরসনে কোনো ভাবেই সাহায্য করত না। এখানেই বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সততা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে প্রাথমিক ভাবে ৩টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : ১. খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বণ্টন। ২. শুধু উদরপূর্তি নয় খাদ্য সুরক্ষার মানে পৌষ্টিক প্রয়োজন মেটানো; এবং ৩. খাদ্য সুরক্ষার অন্যতম প্রতিবন্ধক অর্থাৎ কর্মসংস্থান, মজুরি ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা।

মানুষের খাদ্য সুরক্ষায় শাসককুল যদি সত্যিই আন্তরিক হতেন বিলের প্রথমেই তারা—

১. দেশের সমস্যাসংকুল মন্দা কৃষি ব্যবস্থার দিকে নজর দিতেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান হার ১ থেকে ২ শতাংশ। এই ক্ষেত্রে যদিও দেশের ৬৮ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ কাজ করেন কিন্তু জাতীয় আয়ে এই ক্ষেত্র থেকে সংযোজন মাত্র ২৮ শতাংশ। খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সরকার বিকেন্দ্রিত ভাবে লাভজনক মূল্যে কৃষকদের থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করে স্থানীয় ভাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকর গণবণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারতেন। এক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দূর হতে পারত। খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ না দিলে এবং উৎপাদিত খাদ্যশস্য লাভজনক মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থার গ্যারান্টি না দিলে মন্দায় চলা কৃষিতে কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন বন্ধ করে দেবে— খাদ্যের জন্য আমরা উত্তরোত্তর বহুজাতিক কোম্পানিগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। দেশের খাদ্য স্বনির্ভরতা বিঘ্নিত হবে। খাদ্য নিরাপত্তা বিদেশি বহুজাতিকদের মর্জিতে চলবে। এই প্রসঙ্গে অতীতের পিএল ৪৮০-র অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে দেশের মধ্যে ছত্তীসগঢ় রাজ্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। এই রাজ্যের রেশন ব্যবস্থা এক সময়ে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করা খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করত। গণবণ্টন ব্যবস্থার সংস্কার, খাদ্য নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন ও বিকেন্দ্রিত ভাবে খাদ্যশস্য ক্রয় করার ফলে এই রাজ্য এখন খাদ্যে কেবল স্বনির্ভরই নয়, এই রাজ্য এখন অন্য রাজ্যকে উদ্বৃত্ত চাল সরবরাহ করে।

বিকেন্দ্রিত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও মজুত করা হলে একদিকে যেমন সরকারি কোষাগারে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হবে তেমনি স্থানীয় ভিত্তিতে প্রচুর কর্মসংস্থানের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। ফলে, স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি পরিপুষ্ট হবে।

২. খাদ্য সুরক্ষার নামে উদর পূর্তির জন্য কেবল তণ্ডুল জাতীয় খাবারের (চাল-গম ইত্যাদি) জোগানের চিন্তা না করে পৌষ্টিক প্রয়োজনে অন্তত ডাল ও তেলের সরবরাহের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে তা যেমন মানুষের অপুষ্টির সমস্যার সমাধানে কিছুটা হলেও সাহায্য করত তেমনি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষককে বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে সহায়তা করত।

৩. যে দেশে ৯৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে এবং যাদের কাজের ও মজুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই তারা খাদ্য সুরক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবে কি ভাবে— যদি কর্মসংস্থান ও মজুরির নিশ্চয়তা না থাকে? এক্ষেত্রে গ্রামীণ ১০০ দিনের কাজের আইনকে যেমন প্রসারিত করে বছরে অন্তত মাথাপিছু ২০০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া জরুরি তেমনি শহরে প্রান্তিক মানুষদের জন্য অনুরূপ আইন প্রণয়নও একান্ত আবশ্যিক। তাছাড়া, অগণিত অক্ষম মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা তো রাখতেই হবে। কর্মসংস্থান ও বাঁচার মতো মজুরির প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে দেশের মানুষের জন্য ডোল নির্ভর খাদ্য সুরক্ষা কখনই বাস্তবোচিত ভাবনা নয়।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের শাসককুল এমন এক বিল সংসদে পেশ করেছেন যাতে ৩টি বিষয়ের কোনোটিতেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বিলটিতে খাদ্য বণ্টনের কথা বলা আছে কিন্তু খাদ্য কোথা থেকে আসবে, কী ভাবে উৎপাদন হবে, উপভোক্তারাই বা কী ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করবে সে সম্বন্ধে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান মৌলিক বিষয় অর্থাৎ দেশের কৃষি সমস্যা সমাধানের কোনো উল্লেখ নেই। খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ প্রসঙ্গেও কিছু বলা হয় নি, সমস্যাসংকুল কৃষি ব্যবস্থায় বিপদগ্রস্ত চাষিদের সমস্যা সমাধানে সরকার কী ভূমিকা নেবে বা কী ভাবে তাদের সাহায্য করবে তারও কোনো উল্লেখ নেই এই বিলে। এমন কি কৃষিতে আধুনিকতার অজুহাতে বর্তমানে উৎপাদিত বিষাক্ত খাদ্যের বদলে নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন নিয়ে সরকারি কোনো কৃষি নীতিরও উল্লেখ নেই।

বিলটিতে খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে অথচ খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধকতাগুলি যেমন, বেকারি, নামমাত্র মজুরি, ভূমিহীন মানুষের সমস্যা, উন্নয়নের অজুহাতে জল, জঙ্গল, জমি থেকে ক্রমবর্ধমান উচ্ছেদ ইত্যাদির কোনো উল্লেখই করা হয়নি। অথচ, এই মৌলিক বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়ে দেশে খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সোনার পাথর বাটির মতো অলীক কল্পনা মাত্র।

খাদ্য অধিকার প্রসঙ্গে বহুল নিন্দিত ও সমালোচিত অভীষ্ট গণবণ্টন ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে সর্বজনীন গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু করার পরিবর্তে এই বিলের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বের এপিএল-বিপিএল-এর পরিবর্তে নাগরিকদের তিন

ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদলকে পাকাপাকি বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাদের সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতার বাইরে রাখা হবে অর্থাৎ তাদের জন্য কোনো সরকারি বরাদ্দ থাকবে না। প্রায় আড়াই কোটি মানুষকে '**অগ্রাধিকার গোষ্ঠী**' হিসাবে মাসে ৭ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে যেখান দাম ধরা হয়েছে চাল— ৩ টাকা কেজি, গম ২ টাকা কেজি এবং অন্যান্য দানাশস্য ১ টাকা কেজি হারে। আর বাকি সকলকে '**সাধারণ শ্রেণিভুক্ত**' করা হয়েছে যারা মাথাপিছু মাসে ৫ কেজি হারে খাদ্যশস্য পেতে পারবে।

একজন মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য কতটা খাদ্যের প্রয়োজন? স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা জগতে গবেষণাকারী সর্বোচ্চ সংস্থা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ-এর মতে এক জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সুস্থ ভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজন মাসে ১৪ কেজি খাদ্যশস্য। এই বিশেষজ্ঞ মতকে উপেক্ষা করে সরকার বর্তমানে পরিকল্পনা করছে যে, তারা দেশের ৬৭ শতাংশ মানুষকে এই আইনের আওতায় আনবে এবং বর্তমানে মাসে মাথাপিছু যে ৭ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়া হয় তা কমিয়ে মাথাপিছু মাসে ৫ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য মাথাপিছু ১৬৭ গ্রাম বা আক্ষরিক অর্থে দু'মুঠো গম সারা দিনে খাদ্যশস্য হিসাবে বরাদ্দ করেছে। অবস্থার আরও অবনতি হতে চলেছে কারণ সরকার দানাশস্য ছাড়া ভর্তুকি মূল্যে ডাল ও ভোজ্য তেল সরবরাহের ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্যই করছে না অথচ পুষ্টির বিচারে এগুলি একান্ত অপরিহার্য।

বিলটি লোকসভায় গৃহীত হওয়ার পরে (যদি আদৌ কখনও হয়!) কখন রাজ্যগুলিকে রূপায়ণ করতে হবে সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়সীমা ধার্য করা হয়নি। অর্থাৎ, আইনটি কবে থেকে বলবৎ হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থাৎ একসঙ্গে সারা দেশে নির্দিষ্ট সময়ে বিলটি রূপায়ণের সম্ভাবনা কম। কেবল তাই নয়, বিলটি রূপায়ণের ব্যাপারটি নির্দিষ্ট না করার অর্থ হলো, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যতই ঢক্কানিনাদ করুক না কেন তারা আসলে এই আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করতে মোটেই আন্তরিক নয়। বরং খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়ার নাম করে তারা দেশের শত কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিয়ে রঙ্গ রসিকতায় মেতেছে।

খাদ্যের অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবি

> □□ ... স্বাধীনতার ৬৬ বছর পরেও এখনও দেশের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। অথচ দেশে খাদ্য উদ্বৃত্ত। প্রতি বছর সরকারি গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হয়। একদিকে গুদাম ভর্তি খাবার উপচে পড়ছে আর অন্যদিকে ভুখা পেটে কোটি কোটি মানুষ একমুঠো খাবারের জন্য হা-পিত্যেশ করছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে তাই, এই খাদ্য সুরক্ষার অর্থ 'ভর্তি গুদাম, ভুখা পেট'।

মেনে যদিও এই বিলে আইসিডিএসকে (সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু খাদ্যের সংজ্ঞায় বাজারের প্রক্রিয়াকৃত তৈরি খাবারকে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। আসলে খাদ্যের সংজ্ঞায় এই ধরণের খাবারের অন্তর্ভুক্তি বড়ো বড়ো কোম্পানিকে খাদ্যের গণবণ্টন ব্যবস্থায় ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা মাত্র। যদিও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে এই প্রকল্পে খাদ্যের জোগান দেওয়ার জন্য কোনো কন্ট্রাক্টরকে নিয়োগ করা যাবে না। আইনে খাদ্যের সংজ্ঞায় এই পরিবর্তন আসলে খাদ্য তৈরির বিকেন্দ্রিকরণে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্ম নিরাপত্তা ধ্বংস করবে, বহু মহিলাকে কর্মচ্যুত করবে এবং বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানিগুলির খাদ্যের বাজারে ব্যবসা বাড়াবে।

মাতৃত্বকালীন ভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে মা ও শিশুর প্রতি এই বিলে চরম অবিচার করা হয়েছে। দু'টি মাত্র শিশুর ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। দুই শিশুর নীতি আমাদের দেশের মহিলাদের প্রতি চরম অবিচার। কারণ শিশুজন্মের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মহিলাদের কোনো স্বাধীনতা থাকে না। আবার জন্মের জন্য দায়ী না হলেও নবাগত শিশুকে এই আইনের কোপে পড়তে হয়।

প্রস্তাবিত বিলে গোষ্ঠী রান্নাঘর বা লঙ্গরখানার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অথচ, দেশে সহায়-সম্বলহীন, গৃহহীন, নিঃস্ব ও পরিবার পরিত্যক্ত বহু মানুষের দু'বেলা খাবার জুটতে পারে গোষ্ঠী রান্নাঘর বা লঙ্গরখানা থেকে। পেশ করা বিলে বর্তমানে চালু থাকা 'সহায় প্রকল্প'কে আরও উন্নত করার পরিবর্তে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিঃস্ব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কি করুণ তামাসা!

লোকসভায় পেশ করা এই বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে প্রয়োজনে সরকার খাদ্যের বদলে উপভোক্তাদের নগদ টাকা দেবে। খাদ্যের বদলে নগদ টাকা কখনই খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারবে না। কারণ, অভাবের তাড়নায় প্রাপ্ত নগদ টাকা খাদ্যে খরচ না হয়ে অন্য জিনিসে খরচ হবে আবার এই নগদ টাকা পুরুষের হাতে পড়লে অনেক ক্ষেত্রেই তা খাদ্যের বদলে দারুতে খরচ হবে যা প্রকারান্তরে খাদ্য নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করবে।

প্রস্তাবিত বিলে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। বিলটিতে রাজ্য সরকার ও পঞ্চায়েতি রাজকে কোনো ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। উপরন্তু, প্রস্তাবিত অভিযোগ নিরসন কেন্দ্র কেবলমাত্র জেলা স্তরে থাকার জন্য গ্রামগঞ্জের সাধারণ উপভোক্তার পক্ষে ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

রূঢ় বাস্তব হলো, সরকার খাদ্য সুরক্ষা আইনের অজুহাতে প্রকৃতপক্ষে গণবণ্টন ব্যবস্থায় সরকারি খরচের পরিমাণ কমাতে চাইছে। বর্তমানে যেখানে কেবলমাত্র গণবণ্টন ব্যবস্থায় সরকার ৮৮ হাজার ২৭২ কোটি টাকা খরচ করে সেখানে গণবণ্টন ব্যবস্থা সহ মিড ডে মিল, আইসিডিএস ও অন্যান্য খাদ্য প্রকল্পে সরকার ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১০ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা করছে। এর ফলে গণবণ্টন ব্যবস্থায় বরাদ্দ খরচের পরিমাণ নিশ্চিত ভাবেই কমবে। গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ ৫৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৬১৫ লক্ষ মেট্রিক টন করার কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই বাড়তি বরাদ্দের মধ্যে আইসিডিএস ও মিড ডে মিল প্রকল্পের ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন খাবারও ধরা আছে। ফলে, প্রকৃতপক্ষে গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্য বরাদ্দ বর্তমানের তুলনায় কমে ৫৩৫ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে।

প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন একটি আইন পেতে চলেছি যার জন্য মাথাপিছু খাদ্যের বরাদ্দ ৭ কেজি থেকে কমে ৫ কেজি হবে এবং সামগ্রিক ভাবে খাদ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি না হয়ে

আরও কমে যাবে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। কারণ এই বিলে অভিযোগ নিরসনের তেমন কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। ফলে, দুর্নীতি এবং চুরি অবাধেই চলতে থাকবে, যা রোখার জন্য কোনো রক্ষাকবচ মানুষের হাতে থাকবে না। এই বিলের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহের দায়-দায়িত্বকে এড়িয়ে গিয়ে মানুষকে নগদ অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে খাদ্য নিরাপত্তাকে কেবল বিঘ্নিতই করবে না পেছনের দরজা দিয়ে খাদ্যের বাজারে বহুজাতিক কোম্পানির দরজা খুলে দেবে।

সারা দেশে খাদ্য নিরাপত্তার নামে কেন্দ্রীয় সরকারের ছেলে ভুলানো আইনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আন্দোলন শুরু করেছে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে তারা যেমন দেশের বিভিন্ন অংশে প্রস্তাবিত বিলটি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, যন্তরমন্তরে অবস্থান-ধর্মঘটও করেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাংসদদের সাথে মিলিত হয়ে বিলের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিকে তুলে ধরে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সাংসদকে একটি করে ১৬৭ গ্রাম খাদ্যের প্যাকেট (যা প্রকারান্তরে দু'মুঠো গম বা দুটো রুটি) উপহার দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে আপনারা আইন করে একজন পূর্ণবয়স্ক লোককে সারা দিনে এইটুকু খাদ্যের নিরাপত্তা দিচ্ছেন। এটা কি বাস্তব! এটা কি মানবিক?

আন্দোলনকারীদের দাবি, সোনিয়া গান্ধীর নিজস্ব প্রতিনিধি সহ এখনও পর্যন্ত একজন সাংসদও জোর গলায় সরকারি বিলের সমর্থনে খুব একটা ওকালতি করতে পারেন নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, খাদ্য নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মানুষের দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই মস্করা কি না করলেই চলত না?

এত কিছুর পরেও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভারতের মতো ক্ষুধা জর্জরিত দেশে প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে খাদ্য সুরক্ষা বা নিরাপত্তার কোনো বিকল্প নেই। দেশের মানুষের স্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা তাই অত্যন্ত জরুরি। তবে সেই খাদ্য নিরাপত্তা অবশ্যই ছেলে ভুলানো লালিপপ হলে চলবে না। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা দিতে অবশ্যই সর্বজনীন খাদ্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। মাথাপিছু খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কোনোমতেই বর্তমান বরাদ্দের (মাথাপিছু মাসে ৭ কেজি) কম করা যাবে না বরং মাথাপিছু অন্তত ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে হবে। কারণ, পৌষ্টিক চাহিদা অনুযায়ী মাথাপিছু তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন দৈনিক ৪৫৬ গ্রাম বা মাসে প্রায় ১৪ কেজি। সাথে সাথে অপুষ্টি জর্জরিত মানুষের পুষ্টির প্রয়োজনে মাথাপিছু মাসে অন্তত ১৫০ গ্রাম ডাল এবং ৮০০ গ্রাম ভোজ্য তেল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে দেশের কৃষি ব্যবস্থার সাথে খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নকে অবশ্যই ব্যাবহারিক ভাবে যুক্ত করতে হবে। আর খাদ্যের অধিকার এবং কাজের অধিকারকে সমার্থক করতে হবে। অন্যথায়, খাদ্য সুরক্ষা কেবলমাত্র 'খুড়োর কল' হয়েই বিরাজ করবে। □

এনভায়রনMEND

৪ পাতার পর

সবচেয়ে নিরাপদ। তাই বার বার সেই অতীত শিক্ষার চেষ্টা চলছে বিশ্ব জুড়ে। আসলে, আমরা যা ক্ষতি করেছি পরিবেশের, তাতে কতদিন যে পরিবেশ দিবস পালন করে যেতে পারব, সেটাই ভাবার। আরও কিছুদিন যাতে পৃথিবীর আয়ুটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, তার জন্য তো তোমাদেরই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে, তাই না? তোমরাই তো রাজ করবে আগামী পৃথিবীতে। তার আয়ুই যদি এমন হুড়মুড়িয়ে ফুরিয়ে যায়, তোমরা দাপিয়ে বেড়াবে কোথায়? কী হবে তোমাদের রঙিন স্বপ্নগুলোর? সংকট একেবারে দোরগোড়ায়। অতি আধুনিক প্রযুক্তিও সামাল দিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। তাই, 'সেকেলে' বলে অ্যাদ্দিন যাকে পাত্তা দাওনি, তারই শরণ নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। তবে, একদিনে তো পৃথিবী বদলাতে পারবে না। তাই শুরুটা না হয় নিজের বাড়ি দিয়েই করে ফেলো। দেখো তো, মা-ঠাকুমার রান্নার খাতাপত্তর থেকে কোনো টিপ্‌স পাও কি না।

ভি ন দে শি কে তা য় ফু ড প্রি জা র ভে শ ন

ইন্‌কা সভ্যতা

এখানকার অধিবাসীরা দক্ষিণ আমেরিকায় 'দুনিয়ো'র প্রচলন করে। এটি ছিল আলু সংরক্ষণের একটা কৌশল। এখানে এক ধরণের আলু তৈরি হতো, যা বরফে নষ্ট হতো না। এই আলুকে রাতের প্রচণ্ড ঠান্ডায় প্রথমে জমিয়ে নেওয়া হতো, তারপর চড়চড়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হতো। ফলে আলু নষ্ট হতে পারত না।

মরুভূমির বাসিন্দা

বেদুইন এবং অন্যান্য মরুভূমির বাসিন্দারা এক ধরণের ঘি তৈরি করত। টগবগ করে ফুটতে থাকা মাখন থেকে তার অবশেষটুকু সরিয়ে নিয়ে এই ঘি বানানো হতো। অনেক দিন পর্যন্ত এটি ব্যবহার করা যেত।

চিন

বিশাল একটা ভোজের পর যে পরিমাণ মাংস বাড়তি থাকে, তাই দিয়ে চিনের মানুষ আগেকার দিনে এক ধরণের নোনতা-মিষ্টি শুকনো মাংস তৈরি করত। নাম, 'বাক্কা'। মাংসের স্নেহপদার্থটুকু ছেঁটে ফেলে কুচি কুচি করে কেটে, ভালো করে জারিয়ে রেখে সেঁকে নেওয়া হতো। অনেক দিন ধরে খেলেও যাতে নষ্ট না হয়।

আফ্রিকা

নাইজেরিয়া সহ কিছু পশ্চিম আফ্রিকার দেশে বানানো হয় শুকনো দানাওয়ালা এক ধরণের খাবার 'গাররি'। ও দেশে কাসাভা গাছের কন্দর ছাল ছাড়িয়ে, ভালো করে ধুয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে একটা মণ্ড বানানো হয়। মণ্ডটাকে একটা ছিদ্রওয়ালা ব্যাগে পুরে দিনকয়েক পচতে দেওয়া হয়। ব্যাগের ওপরে চাপানো হয় ভারী কোনো বস্তু, যাতে জলটা বেরিয়ে যেতে পারে। এরপর সেটিকে ভালো করে ছেঁকে রোস্ট করে নেওয়া হয়।

কৃ ত জ্ঞ তা স্বী কা র :
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুন ২০১৩।

খাদ্য তালিকায় ফুল

অনুপম পাল

ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারি দিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা

ফুল পছন্দ করেন না এমন মানুষ কেউ আছেন বলে মনে হয় না। শীতের পর বসন্তকালে গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুল আর পাখির কলতান নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালীন ফুলের অভাব নেই। কবির অন্তরের ভাবনায় মনে হয় ফুল যেন কিছু বলতে চায়। এ এক সুন্দর, অনন্য অনুভূতি। তবে এখানে আমরা ফুলের এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য ছেড়ে অন্য আর একটি দিক নিয়ে সামান্য আলোচনা করব।

ফুল সপুষ্পক উদ্ভিদের সব থেকে সুন্দর অংশ। পোকামাকড়, পাখি ফুলের আকর্ষণে কাছে আসে মধুর লোভে। এর ফলে পরাগ মিলনটাও হয়ে যায়। আর পরাগ মিলন না হলে ফল বীজ তৈরি হবে না। উদ্ভিদের বংশবিস্তারও স্তব্ধ হয়ে যাবে। পাতার ও কান্ডের সংযোগস্থলে বা শাখাপ্রশাখার অগ্রভাগে ফুল ফোটে।

ফুল প্রেমের প্রতীক, ভালোবাসার প্রতীক। উপহার হিসেবে ফুলের তুলনা নেই। পুজোর অর্ঘ্যে ফুল, ফুলদানিতে ফুল, খোঁপায় ফুলের মালা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া ইত্যাদি আমাদের চেনা দৃশ্য। কিন্তু খাদ্য হিসাবে ফুল? না, খুব একটা নতুন বিষয় নয়।

আমরা অল্পবিস্তর ভোজ্য ফুলের সঙ্গে পরিচিত। পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশি ফুল খাওয়া হয়। মোচা, বক, সজিনা বা সজনে ও কুমড়ো ফুল নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। বক ও সজনে সারা বছর পাওয়া যায় না। ফুল অনুযায়ী অনেক রকম রন্ধন প্রণালীও আছে। ফুল বেশি দিন ঘরে রেখে খাওয়া হয় না। তবে প্রথাগত কৃষিবিদ্যার বইয়ে খাদ্য হিসাব ফুল নিয়ে বিশেষ কোনো অধ্যায় নেই। এ নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা ও গবেষণা কোনোটাই হয় না। অথচ পুষ্টিকর খাবার হিসাবে খুব সহজেই ফুলকে আরও বেশি করে খাদ্য তালিকায় যোগ করতে পারি। সারা বছরই আমাদের দেশে বিভিন্ন ফুল পাওয়া যায়। তবে রঙিন ফুল মানে তাতে ভিটামিন এ-র প্রাথমিক যৌগ, বিটা ক্যারোটিন, ক্যানসার প্রতিরোধক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ফ্লাভোনয়েড বলে বহুল প্রচলিত, অন্যান্য খনিজ লবণ, ভিটামিন বি, সি, প্রোটিন ও শর্করা থাকে। মরশুমি ফুল ডানডেলিওনসে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যৌগ হিসাবে হিসাবে অনেক ধরণের ফ্লাভোনয়েডস ও ক্যারোটিনয়েডস থাকে যা ব্রকলির থেকে ৪ গুণ বেশি। এছাড়া রয়েছে ভিটামিন বি, সি ও ই। বেগুনি রঙের ফুলে রুটিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। নাসটারসিয়াম ফুলে থাকে ক্যানসার প্রতিরোধক লাইকোপিন। ডায়ানথাস ও চন্দ্রমল্লিকা ফুলে সর্বাধিক খনিজ লবণ আছে— পটাসিয়ামের পরিমাণ বেশ ভালো ১৮০০ মিগ্রা/কেজি থেকে ৪০০০ মিগ্রা/কেজি যা কুমড়ো ও ন্যাসপাতির থেকে ১০০-২০০ মিগ্রা/কেজি বেশি। তবে কুমড়ো ফুলে প্রায় ২০০০ আন্তর্জাতিক একক বিটা ক্যারোটিন থাকে এবং মোচায় ৫৭১ মিগ্রা/কেজি পটাশিয়াম ও ৪৩ মিগ্রা/কেজি লোহা থাকে।

খাওয়ার জন্য আলাদা করে ফুল চাষ করতে হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঝরে পড়া ফুলই ব্যবহৃত হয়। বাজারে কোনো কোনো সময় সবজির দাম খুব বেড়ে যায়। তখন মরশুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফুল খাওয়া যেতে পারে। প্রথাগত খাদ্য তালিকার বাইরে এটা একটা নতুন ধারণা। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও প্রচার দরকার। যেমন ভাবে সহজলভ্য প্রোটিন হিসাবে পঙ্গপাল, এন্ডি রেশম মথের পিউপা, পিঁপড়ের ডিম পৃথিবীর বহু দেশে খাওয়ার চল রয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য সংস্থা খাদ্য তালিকায় পোকার স্থান দিয়েছেন কারণ পোকায় খনিজ লবণ, প্রোটিন ও ভিটামিন পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং বহু জনগোষ্ঠীর মধ্যেই খাওয়ার চল রয়েছে। তাছাড়া এর থেকে কোনো রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

খা দ্য হি সা বে ফু ল

মহুয়া : ফুল হিসাবে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়, ভারতের অনেক আধিবাসীর প্রিয় গাছ। গাছকে ঘিরে উৎসব পালিত হয়, জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তীসগঢ় ইত্যাদি জায়গায় মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছের তলায় পড়া ফুল সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের সারা বছরের চাহিদা মেটে। ফুল রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। বাজারে বিক্রিও করা হয়। ফলের গন্ধে ও পাকা ফলের লোভে হাতির আনাগোনা বাড়ে। ভারতে মোটামুটি ভাবে বছরে ৬০,০০০ মেট্রিক টন ফুল পাওয়া যায়। শুকনো ফুল দিয়ে গ্রীষ্মকালে শরবত বানানো হয়, ২৮ রকমের জড়িবুটি দিয়ে তৈরি *বাখর* দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গের মদ তৈরি হয়। মহুয়া ফুল অন্যান্য শাকসবজির সঙ্গে মিশিয়ে তরকারি করা হয়। কাঁচা ফলের শাঁস *কচড়া* সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। পাকা ফলের তেল রান্নার কাজে লাগে। একটা বড়ো গাছ থেকে প্রায় ৪০ কেজি তেল পাওয়া যায়।

মোচা : সব কলারই মোচা খাওয়া হয়, বিচে কলার মোচার স্বাদ ভালো। নিমোচা কলার পুরো মোচাটাই কলায় পরিণত হয় তাই মোচা খাওয়া যায় না।

বক ফুল : বেশি দিন বাঁচে না, ৪-৬ বছর। শিকড়ে অর্বুদ হয়। শীতকাল থেকে গরমের প্রথমের দিকে পাওয়া যায়। একটা ৩ বছরের গাছ থেকে

দৈনিক ১৫০টা ফুল পাওয়া যেতে পারে।

কুমড়ো ফুল : সারা বছর পাওয়া যায়। বিটা ক্যারোটিনের জন্য হলুদ রঙের হয়। ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ফ্লাভোনয়েড ও ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ।

সজনে ফুল : বসন্ত কালে বসন্ত প্রতিরোধক হিসাবে খাওয়া হয়। ১৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। একটা ৫ বছরের গাছ থেকে ৩০ কেজি ফুল পাওয়া যেতে পারে।

কচুরি পানার ফুল : বঙ্গদেশের জলাশয়ে প্রচুর পাওয়া যায়। শীতের শেষ থেকে গ্রীষ্মের শেষ সময় পর্যন্ত পাওয়া যায়। ফুল টুকরো করে ব্যাসনে ভাজা হয়, পোস্তর সঙ্গে বেটে তেল পাঁচফোন সহ সাঁতলে নিয়ে খাওয়া যায়। এছাড়া ফুলের কুঁড়িও ওই ভাবে খাওয়া হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বাংলাদেশের বরিশাল, টাঙ্গাইল, পাবনা জেলায় চল আছে। লক্ষ্য রাখতে হবে কচুরি পানা যেন নোংরা-নর্দমার জলে, কারখানার পাশের ড্রেনের থেকে সংগ্রহ না করা হয়। এতে ভারী ধাতুর আধিক্য থাকতে পারে।

যুক্তি ফুল (*ওয়াকাক্কা ভলুবিলিস*) : লতানে গাছ, বসন্তকালে সবুজ সাদা রঙের থোকা থোকা ফুল হয়। বসন্ত প্রতিরোধক হিসাবে ভেজে খাওয়া হয়, খুব তেতো স্বাদ। ১৫০ টাকা কেজিতেও বিক্রি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এর চল আছে।

অশোক ফুল : লাল রঙের, বসন্ত কালে হয়। স্ত্রী রোগে এর ব্যবহার আছে, ভেজে খাওয়া হয়।

পদ্ম : এরা সবটাই প্রায় খাওয়া যায়। স্থূলত্ব নিবারক, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন এ, বি ও সি সমৃদ্ধ। থাইলান্ডে চল আছে।

রঙ্গন (*ইক্সোরা চাইনেনসিস*) : লাল, হলুদ ও সাদা রঙের হয়, থাইলান্ডে খাওয়ার চল আছে।

সুবাবুল : মধুমেহ রোগ প্রতিকারক, কচি শুটি ও সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। থাইল্যান্ডে ব্যবহৃত হয়।

জবা : ভিটামিন সি ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ। ভেষজ চা হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

জুঁই : সুগন্ধ ফুল, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, ভেষজ চা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সূর্যমুখী : পাপড়ি খাওয়া হয়।

সরিষা : ভিটামিন সি ও ফ্লাভোনয়েড সমৃদ্ধ। ভেজে ও অন্যান্য উপায়ে খাওয়া হয়।

মুলো ও মটর : শীতকালে পাওয়া যায়।

সাদা জবা : স্ত্রী রোগে এর ব্যবহার আছে। শরবত করে খাওয়া হয়। রঙিন জবা দিয়ে ভেষজ চা হয়।

গাঁদা : শীতকাল বাগানে প্রচুর হয়, হলুদ গাঁদা ব্যসনে চুবিয়ে ভাজা হয়। লালচে গাঁদা খাওয়া হয় না।

পলাশ : বক ফুলের মতো খাওয়া যায়, ফ্লাভোনয়েড ও ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ।

কচু : কালো কচুর ফুল ফোটার আগে খেতে হবে। প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে।

পিঁয়াজ : শীতের শেষে ভেজে খাওয়া যায়।

থোকা টগর : সাদা রঙের ঈষৎ বড়ো ফুল, নীচের বৃতি ফেলে দিয়ে ব্যসনে চুবিয়ে ভাজা হয়।

গ্লাডিওলাস,ক্যালেন্ডুলা,পানজি, স্নাপড্রাগন ইত্যাদির ইউরোপে খাওয়ার চল আছে।

ট্যাঁড়শ ও টক ট্যাঁড়শ : ট্যাঁড়শের ফুল অল্পবিস্তর সারা বছর পাওয়া যায়, টক ট্যাঁড়শের ফুল নভেম্বর মাসে পাওয়া যায়।

অপরাজিতা : মটল ও বক ফুলের মতো ফুলের পুংকেশর ফেলে দিয়ে খেতে হয়।

সোঁদাল (*ক্যাসিয়া ফিসচুলা*) : মে মাসে গাছে হলুদ রঙের ফুলে গাছ ভর্তি হয়ে যায়। বীজ লম্বা লাঠির মতো ঝুলতে থাকে তাই একে বাঁদরলাঠি বলা হয়। ফ্লাভোনয়েড ও ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ। ব্যসনে চুবিয়ে ভাজা হয়। একটা গাছ থেকে ৩০ কেজি ফুল পাওয়া যেতে পারে।

সাফরন : কাশ্মীরে হওয়া এই ফুল পৃথিবীর সব থেকে দামী (পুংদণ্ড), মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। ঔষধি গুণও আছে।

ফণি মনসার ফুল (*ওপাংশিয়া ফিকাস-ইন্ডিকা*) : মেক্সিকোতে খাদ্য হিসাবে চল আছে।

সতর্কতা : ফুল অবশ্য কীটনাশক ও রাসায়নিক সার বর্জিত হতে হবে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে অন্যান্য ফসলের মতো অ্যালার্জি হতে পারে। ফুলের পুংকেশর ও গর্ভমুণ্ড বাদ দিয়ে খেতে হবে। রাসায়নিক সার ও বিষ দিয়ে উৎপাদিত ফুল ও বাজারে বিক্রি হওয়া পুজোর ফুল না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। □

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী

দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)

পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা)

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

গ্রাহক চাঁদা :

১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।

পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন :

৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭

রাজনীতির কোপে শিল্প

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমশ পিছিয়ে পড়ার পিছনে রাজনীতি একটি বড়ো কারণ। স্বাধীনতার পর থেকে এ রাজ্যের শিল্পের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বসলে চারটি পর্বে গোটা বিষয়টি ভাগ করে দেখলে এর গতিপ্রকৃতি ও বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে। প্রথম পর্ব : স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে রাজ্যের ক্ষমতায় বামফ্রন্টের আগমন। দ্বিতীয় পর্ব : বামফ্রন্টের প্রথম ১৭ বছর (১৯৭৭ থেকে ১৯৯৪)। তৃতীয় পর্ব : ১৯৯৪ থেকে ২০১১, যে সময়টাতে বামফ্রন্ট খোলা গলায় পুঁজির আবাহন করেছেন নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। চতুর্থ পর্ব : ২০১১ থেকে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসা। সুদীর্ঘ এই পর্বে শিল্পের ক্রমশ অধোগতির পিছনে প্রথম দিকে যতটা ছিল কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের রাজনীতি, দ্বিতীয় পর্বে ছিল মাসুল সমীকরণ ও লাইসেন্স-রাজের ফাঁসে জড়িয়ে যাওয়া। তৃতীয় পর্বে রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে উদারনীতির মুখে সিপিআইএমের নয়া শিল্পনীতি আর চতুর্থ পর্বে জমি জটে আটকে থাকা রাজ্যের শিল্পসম্ভাবনা-শিল্পহীনতা ও তৃণমূল সরকারের নতুন শিল্পনীতি।

স্বাধীনতার পর দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এদেশে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে পাঞ্জাবের মতো পশ্চিমবঙ্গকেও কেন্দ্রের বিশেষ সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেখানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল শিল্পায়নে সম্ভাবনা তৈরি করার জন্য রাজ্যের কংগ্রেস সরকারকেও বিশেষ সাহায্য করে নি। ফলে কৃষির সমৃদ্ধি রাজ্যের শিল্পায়নে পুঁজি সরবরাহে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় তার প্রসারে সুযোগ করে দিতে। কারণ দেশবিভাগজনিত অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, যা পুরোটাই গিয়ে পড়ে কৃষিক্ষেত্রের উপর। স্বাধীনতার পর প্রথম দশকেই রাজ্য তাই শিল্পের সুবিধা হারাতে বাধ্য হয়। শিল্পে এই সময়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ঘটে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। খানিকটা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই কেন্দ্র এ রাজ্যের শিল্পায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার নাম করে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ ভাবে কেন্দ্রের অবস্থানই রাজ্যকে পিছিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রের বাংলা-বিরোধী এই রাজনীতির স্বরূপটা কতখানি অগণতান্ত্রিক ছিল তা বোঝা যাবে গুটিকয় পরিসংখ্যানেই।

শিল্পের অধোগতির সূচনা ছয়ের দশক থেকেই, সেটা চোখে পড়ে তৃতীয় যোজনাতেই। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যের শিল্প দ্রব্যের অর্থমূল্য ছিল সর্বভারতীয় গড়ের ২২.২ শতাংশ। এরপর তা কমতে থাকে। ১৯৬১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৮.৪ শতাংশে, ১৯৭০ সালে ১৪.৪ শতাংশে এবং ক্ষমতায় বামফ্রন্ট আসার আগে তা ১০.৯ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ওই সময়ই এ-রাজ্য শিল্পে সারা ভারতে দ্বিতীয় স্থানে নেমে আসে।

এর পরের পর্বে পশ্চিমবঙ্গকে কোণঠাসা করার কেন্দ্রীয় রাজনীতি মারাত্মক রূপ নেয়। বলা বাহুল্য ভারত সরকারের শিল্পনীতি সেই ভাবেই তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে বিভিন্ন রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় চারশো শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর করে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্র পায় ১৩৪টি। আর পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে শীর্ষস্থানে থাকার 'অপরাধে' পায় ৬৭টি। পাঁচ বছর পরেও এই প্রবণতা বদল হয় নি। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার মঞ্জুর করেছিল মোট ৩৭৭টি লাইসেন্স। এর মধ্যে একা মহারাষ্ট্র পায় ১১২টি, পশ্চিমবঙ্গের কপালে জোটে মাত্র ৪৬টি। মাসুল সমীকরণ নীতি যেন করা হয়েছিল এ রাজ্যকে পিছিয়ে দিতেই। এই রাজ্য থেকে কয়লা বা লোহা অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেলের মাসুল কাঠামো সর্বত্র একই রাখা হয়, অথচ পশ্চিমবঙ্গের তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য তুলো আনলে তখন দিতে হয় বাড়তি রেল মাসুল। বহুবার এই নিয়ে রাজ্যের পুনর্বিচারের আবেদন কেন্দ্র নাকচও করে দেয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির হাত ধরে দুর্গাপুরে চিত্তরঞ্জনে, কল্যাণীতে বড়ো বিনিয়োগ হলেও দু'একটি শিল্পপ্রকল্প একটি রাজ্যের অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। ঘুরে দাঁড়াতে লাগে অর্থনৈতিক কাঠামোগত পরিবর্তনে উৎপাদিকা শক্তির পুনর্বিন্যাস। লাগাতার পুঁজির সরবরাহ, সহজলভ্য ব্যাঙ্ক ঋণ, এ-সবই আসে মূলত কেন্দ্রের সহায়তায় ও নীতিগত উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। সেই জায়গাটাই ছিল না এ রাজ্যে। অথচ প্রথম থেকে যদি কেন্দ্র এই রাজ্যের জন্য সঠিক ভাবে এগিয়ে আসত তাহলে পুরো ছবিটাই আজ অন্যরকম হতে পারত। পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সরকারও এগিয়ে আসে নি। নতুন শিল্পেও বিনিয়োগে উৎসাহ দেয় নি। এর ফলে ১৯৬৬ সালের পর থেকে বিশেষত সত্তরের দশক থেকে শিল্পে উৎপাদন দিনকে দিন কমেছে। ১৯৭০ সালকে ভিত্তি ধরে নিয়ে শিল্প উৎপাদক-সূচক ১৯৭৩-এ ছিল ৯৯.৯; ১৯৭৬-এ ছিল ১০৮.৮; ১৯৭৮-এ হয়েছিল ১০২.৮। কয়লা, লোহা, ইস্পাত সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন কমে যায়। মাসুল নীতির জন্য সবচেয়ে কমে যায় সুতো ও সুতিবস্ত্র উৎপাদন। ১৯৭৩-এ সুতো উৎপাদন ৫৪৫.৩ লক্ষ কিলোগ্রাম থেকে কমে ১৯৭৮-এ ৩৪৯.৪ লক্ষ কিলোগ্রামে এসে দাঁড়ায়। ১৯৭৩-এ সুতিবস্ত্র উৎপাদন হয়েছিল ১৯.৩৬ লক্ষ মিটার। ১৯৭৮-এ কমে হয়েছিল ১.০৩৮ লক্ষ মিটার। সামগ্রিক ভাবে শিল্পে প্রলম্বিত হতে থাকে হতাশার ছবি। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়তে থাকে এরপর সর্বভারতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির তুলনায়। এর প্রভাব পড়ে কর্মসংস্থানে। চিফ ইন্সপেক্টর অফ ফ্যাক্টরিজের দেওয়া তথ্য অনুসারে ১৯৫১ সালে রেজিস্টার্ড কারখানায় কর্মসংস্থান হয়েছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ কর্মপ্রার্থীর। ১৯৬৫ সালে যখন শিল্প

নিয়ে বিশেষ সমস্যা তৈরি হয় নি তখন কর্ম-সংস্থানের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ৮.৮০ লক্ষ। তারপর শুরু হলো ভাঁটা। ১৯৬৯ সালে সংগঠিত শিল্পে কর্মসংস্থান কমে ৭.৯১ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমদিকে এই বৃদ্ধি বা তারপর হ্রাস পাওয়া, যাই-ই ঘটুক তার সবটাই রাজ্যের জনসংখ্যার বৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। ফলে বাড়তে থাকে বেকারত্বের হার। ১৯৭১ সালের আদমসুমারির হিসেবে কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষ ছিল রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ। কৃষির উন্নয়নে তৃতীয় যোজনাকাল পর্যন্ত বিশেষ অগ্রগতি হয় নি। কৃষির উন্নয়নে এই রাজ্যের ছিল সবুজ বিপ্লবের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। তাতে কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। কৃষির উন্নয়ন কুক্ষিগত হয়েছিল সম্পন্ন চাষিদের কোঁচড়ে। বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়নি। ফলে উপায় ছিল একমাত্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উন্নয়ন। কারণ এই সময় থেকেই বৃহৎ শিল্পে অবক্ষয় শুরু হয়। সরকারি নীতি ও উদ্যোগহীনতায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ তখন হচ্ছিল স্লথগতিতে। ফলে সঠিক ভাবেই কর্মসংস্থানের সুযোগ কমতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল রাজ্যের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের মাধ্যমে ব্যাপক ঋণ দান। কিন্তু তাও করা হয়নি। ১৯৭৫ সালে এই রাজ্যে কৃষিঋণ বাবদ মাত্র ২২.৩৬ কোটি টাকার কিছু বেশি ব্যাংকগুলি দিয়েছিল আগাম ঋণ হিসেবে। ওই বছরের সমস্ত ব্যাংকের ঋণ ও বিনিয়োগের ধরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রাজ্যের উৎপাদনের ৪০ শতাংশের বেশি জোগান দেয় কৃষি, তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে সমগ্র ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ--- ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশ। ব্যাংক বেশি উৎসাহ দেখিয়েছে ট্রেডিং ব্যবসায়, চটজলদি মুনাফার জন্য, অর্থনীতির পরিকাঠামো উন্নয়নে টাকা ঢালতে চায় নি। তাই শস্যের ভিত্তিতে বছরওয়াড়ি হিসেবে ঋণ দিলেও অগভীর নলকূপ বসাতে ঋণ দানে পিছিয়ে গেছে। এককথায় গ্রামীণ সমাজের মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াকে জোরদার করে তা দিয়ে রাজ্যে শিল্পায়ন ঘটাতে যে ঋণ নীতির প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রীয় সরকার তাতে উৎসাহ দেখায় নি। এর বিপ্রতীপে ছিল সমবায় আন্দোলন। সেটিতে এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা ব্যর্থতায় ভরা। জোতদার মহাজনদের হাত থেকে তাই যেমন দরিদ্র কৃষকদের উদ্ধার করা যায় নি, তেমনই শিল্পে মূলধন সরবরাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যের জোরেই দেশ বিভাগজনিত ক্ষত সামলে পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকখানি এগিয়ে যায়। রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয়ের হিসেবে ১৯৬০-৬১ সালে মহারাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয় স্থানে ছিল পশ্চিমবাংলা, তৃতীয় স্থানে ছিল পাঞ্জাব। পাঁচ বছর পর পাঞ্জাব টপকে যায় শীর্ষস্থানে। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ নেমে আসে তৃতীয় স্থানে। পাঞ্জাব সেই থেকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের সুবিধা পেয়ে নয়া উদারনীতি গ্রহণের আগে পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ের নিবিড়ে সর্বোচ্চ স্থানেই থেকে যায়। পশ্চিমবাংলা তৃতীয় থেকে নেমে আসে পঞ্চমে। (সূত্র : *ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট*, ১৯৮০ থেকে ২০০১-০২।)

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিমাতৃসুলভ নীতি রাজনীতিতে রাজ্য কংগ্রেসকে ক্রমশ কোণঠাসা করে দেয়। রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এই বচসার জবাবে উত্তর দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। আপ্ত বাক্যের মতো যা তারা আওড়াতেন মানুষ তা শুনতে চাইত না। আসলে বেকারত্বের ক্রমবর্ধমান চাপ কৃষির উপর পড়ায় গ্রামে ভূমিহীন খেতমজুর বর্গাচাষিদের সঙ্গে জোতদার মহাজনদের একটা সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল। চল্লিশের তেভাগা আন্দোলনের রেশ পঞ্চাশেই শেষ হয়ে যায়। এরপর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা চালু হলে সেগুলিকে গ্রাস করে নেয় জমিদার ভূস্বামী শ্রেণি। তাদের লেজুড় হিসেবে ছিল এক মধ্য শ্রেণি, যাদের একটি বড়ো অংশ ছিল মধ্যবিত্ত কৃষক। ভোটের রাজনীতিতে এই শ্রেণিরা শাসকদলের কাছাকাছি থেকেছে। ফলে কংগ্রেস মানেই সম্পন্ন, আর বিপন্ন যারা তাদের প্ল্যাটফর্ম হলো বামপন্থীরা। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে ক্ষমতায় পালাবদল ঘটিয়েও তারা কৃষক মজুরের দাবি রূপায়ণে ব্যর্থ হয়। যুক্তফ্রন্টের নামে সেই স্বল্পায়ু বাম শাসন অবশ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের একটা বার্তা দিতে পেরেছিল। কিন্তু অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার মতো কোনো যথার্থ রোডম্যাপ তারা দেখাতে পারে নি। ঘোষণা ছিল তার চাইতেও বেশি নজর ছিল ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সংগঠন বৃদ্ধির দিকে। অথচ মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান না করতে পারলে যে সংগঠনকে সুস্থিত করে বাড়ানো যায় না সে-কথা তখনকার বামদলগুলির নেতৃবৃন্দ বিস্মৃত হয়েছিল। ফলে মানুষের সমস্যার মোকাবিলায় ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছিল না। উল্টে আত্মক্ষয়ী লড়াই ছিল নিজেদের মধ্যে। স্বভাবতই ব্যর্থ এই সংসদীয় বামেদের স্থানে মাথা চাড়া দেয় অতি বামপন্থা। তিনটি যোজনা পার করে নেহরু-মহালনবিশ উন্নয়নের মডেল ততদিনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। শহর দিয়ে গ্রামের উন্নয়নের ভাবনা আর ধোপে টিকছে না। উল্টে কলকাতার মতো মহানগর ছেড়ে দলে দলে লোক জীবিকার সন্ধানে তখন পালাচ্ছিল। গ্রামে-শহরে সীমাহীন দারিদ্র্যে কোণঠাসা সাধারণ মানুষও। বেকারত্বের তীব্র দহনে জ্বলছে যে যুবসমাজ তার একাংশ সরকারের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়াকে ইস্যু করেই রাজনৈতিক নেতাদের মুনাফাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এমনই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলায় শুরু হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে একদল অতি বামপন্থী যুবক শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অর্থনীতি যখন প্রায় বন্ধ্যা হয়ে পড়ে অথবা জনসংখ্যার চাপে ও চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন রাজনীতির ভিতর থেকে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে বিপ্লবমুখী সংঘর্ষের সূচনা ঘটে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। সত্তর দশকের সূচনায় এই আন্দোলন বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মারাত্মক একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। খেটে খাওয়া গরিব মানুষকে উপেক্ষা করে যে আর সরকার চালানো যাবে না, এমন একটা বার্তা দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ভূমি সংস্কার, প্রকৃত কৃষকদের অগ্রাধিকার, অনগ্রসর এলাকায় উন্নয়ন, ন্যূনতম মজুরি আইন, ব্যাংকের মাধ্যমে স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণদান বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিদের সহায়তার মতো বিষয় গুরুত্ব পায়, ইন্দিরা জামানার গরিবি হঠাও বা 'বিশ দফা' উন্নয়ন ফর্মূলা এই পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহীত হয়। কিন্তু নকশাল আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার মতো আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তখনও প্রস্তুত ছিল না। তাই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহায়তায় সরকার সহানুভূতি আদায়ে সক্ষম হয় এবং প্রশাসনকে নির্মম ভাবে ব্যবহার করে আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনই রক্তক্ষয়ী দিনগুলি যেতে না যেতেই শুরু হয় দেশজুড়ে ইন্দিরা জমানার 'জরুরি অবস্থা'। এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তাল থাকে সত্তর দশকের একটা বড়ো পর্ব। এই পরিস্থিতিতে বড়ো শিল্প পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। ১৯৭০ থেকে ৭৭ পর্যন্ত টালমাটাল

রাজনীতির আবহাওয়ায় কোনো শিল্পপতি বড়ো কোনো প্রস্তাব কার্যকর করতে এগিয়ে আসেন নি। শিল্পে যে অবক্ষয়টা ১৯৬৫-র পর শুরু হয়েছিল তা এই সমস্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অসন্তোষে দীর্ঘায়িত হয়। ১৯৭৭-এ রাজ্যের ক্ষমতায় সিপিআইএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর রাজ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। তবে শিল্পের মরা গাঙে জোয়ার আনা যায় নি। কারণ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার রাজনৈতিক ভাবেই রাজ্যের বিমাতৃসুলভ নীতি আরও বেশি করে অনুসরণ করতে থাকে।

কেন্দ্রে কংগ্রেস রাজ্যে বাম—চাপান উতোরের রাজনীতি আর যুযুধান কৌশলে শেষপর্যন্ত রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হয়। কেন্দ্রের লাইসেন্স রাজ রাজ্যের ফাঁস আরও দৃঢ় করে। ১৯৭৭ থেকে ৮৭ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল ৪৩৪টি। অথচ মহারাষ্ট্র প্রায় ১২৫৪টি। গুজরাট পায় ৭৮৮টি, তামিলনাড়ু পায় ৬৩৪টি, (সূত্র : *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, নভেম্বর ২১, ১৯৯৮, পৃ. ৩০৫৬)। এর ফলে রাজ্যের শিল্পায়নে বড়ো বিনিয়োগ আসা ক্রমশ কমতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেটা করেছে কেন্দ্র। তারপরেও সারা দেশের গণমাধ্যমে এ রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমদিকে বেশ কয়েক বছর ন্যায্য অধিকার নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সরকারের থেকেও সমর্থন জুগিয়েছিল। সেটাকে হাতিয়ার করে এমন একটি ভাবনা শিল্পমহলে প্রচার করা হয় যে, এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ নেই। এখানে সরকারি মদতেই শাসকদল ও তাদের শ্রমিক সংগঠন কারখানায় তালা ঝোলাতে আগ্রহী বেশি। এটাও ঠিক যে, এই সময়ে শিল্প শ্রমিকরা বহু বহু ধর্মঘট করে, সরকারও নমনীয় দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখে। অভিযোগ ছিল সিপিআইএমের বিরুদ্ধে বেশি যে, তারা শ্রমিক ক্ষেপিয়ে মালিক তাড়ানোর ব্যবস্থা করছে। প্রচার করা হয়েছে যে, মজুরি বৃদ্ধি বা অন্যান্য ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকের পাশে বাম সরকারের হয়রানির শিকার হয়ে মালিকরা কারখানা বন্ধ করে শেষপর্যন্ত এ রাজ্য থেকে পুঁজি অন্যত্র নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এটা সত্য নয়। শ্রমিক ধর্মঘটে যত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি নষ্ট হয়েছে মালিকদের লকআউটে। আসলে মালিকরাই কারখানা চালাতে পারছিল না। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে তখন প্রয়োজন ছিল পুনর্গঠনের। আর তার জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন লগ্নি, যা পাওয়ার সহজতম সূত্র ছিল ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য। কেন্দ্র সেই সাহায্যটা করেই নি। যখন রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল সেই সময়ে ১৯৭১ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ দিয়েছিল ৮ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাঁচ বছরের মধ্যে তা কমে গেল ৫.৬ শতাংশে। অথচ ওই সময়ে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু পেয়েছে ১০ থেকে ১৮.৬ শতাংশের মধ্যে। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের মাত্র ৩.৯ শতাংশ রাজ্যের কপালে জুটেছে, যেখানে মহারাষ্ট্রের জন্যে এর পরিমাণ ২১ শতাংশ, গুজরাটে ১৩.৫ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৯ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭.২ শতাংশ। একই ভাবে কমেছে ব্যাংকের ঋণ। ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ আমানত ব্যাংকগুলিতে জমা পড়ে তার ৪৬.১ শতাংশ রাজ্যের উন্নয়নে বিনিয়োগ হয়েছিল। অথচ মহারাষ্ট্রে হয়েছিল ৭২.৩ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৯৬.১ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৭২.১ শতাংশ।

শিল্পায়নের চিত্রে পশ্চিমবঙ্গ কেন মহারাষ্ট্র, গুজরাট থেকে পিছিয়ে এ-অভিযোগের জবাবে তাই একটা রূপরেখা পাওয়া যায়। বামেদের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগকে অতিরঞ্জিত করে না ভাবলেও এর বাস্তব ভিত্তি ফেলে দেওয়ার মতো নয়। এটা তো ঠিক বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত না হলে শিল্পে অগ্রগতি অসম্ভব। সত্তর দশকের গোড়া থেকে আশির দশকের শেষপর্যন্ত এ রাজ্যে বিদ্যুৎ দুর্ভিক্ষ চলেছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য পাওয়া যায় নি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিতে। তাই রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর তৈরির স্লোগান ওঠে। দৃষ্টান্ত তৈরি হয়। এতে যেমন 'বঞ্চনার রাজনীতি' ছিল, তেমন এটাও প্রমাণিত হয় যে, রাজ্য শিল্পজগতে চাইলেও কেন্দ্র হাত গুটিয়েই থাকত। কেন্দ্রের এই ভূমিকাকে আড়াল করার জন্যই শিল্পে রাজ্যের অধোগতির জন্য জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে সামনে এনে প্রচার করা শুরু হয়, দাবি করা হয় বামফ্রন্ট সরকারকে। আসলে ঘটনা হলো বামফ্রন্ট সরকার যত বেশিদিন ক্ষমতায় থেকেছে, ধীরে ধীরে তারাও শিল্পায়নের স্বার্থে মালিকের পক্ষেই অবস্থান নিতে শুরু করে। আশির দশক থেকেই রাজ্যে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাশ টানে সরকারে থাকা সিপিআই-এমের শ্রমমন্ত্রীই। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর অবস্থানই বাম সরকারকে মালিক-বিমুখ নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। ফলে নব্বইয়ের দশকে শ্রমিক অসন্তোষে কারখানা বন্ধের সংখ্যা অনেক কমে যায়। তখন অনেক বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন উল্টো অভিযোগ করত যে বামফ্রন্ট সরকার এখন শ্রমিকের হাতুড়ি ছেড়ে মালিকের হাত ধরেছে। বাস্তবে সরকারে এসে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনকে যে শক্তি জোগালে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সমস্যা মিটবে না এটা বুঝতে বেশি দিন নেয়নি জ্যোতি বসুর সরকার। কিন্তু প্রাথমিক পর্বের শুরুতে তারা শ্রমিকদের যে ইন্ধন জোগাত সেটাকেই সামনে রেখে স্রেফ রাজনীতির কৌশলে প্রচার করা হয়। মহারাষ্ট্রেও শ্রমিক অসন্তোষ অনেক বেশি। সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসক দলের মনোভাব। তারা শ্রমিক অসন্তোষকে রাজনৈতিক সমর্থন জোগায় ক্ষমতায় ফিরে আসা ও টিকে থাকার কারণে। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ তাই একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই মানসিকতা গ্রাস করেছিল দেশের তাবড় বৃহৎ শিল্পপতিদের। তাদের সংগঠন সিআইআই রিপোর্টে লিখেছিল পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের আবহাওয়া নেই। কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে কংগ্রেস শিল্পপতিদের মগজে এটা ঢোকায়। আসলে রাজনৈতিক কারণেই বামেদের বিরোধিতা করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনায় এই ভাবে জল ঢালা হতো যার শিকার হতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত রাজ্যবাসীকে। অবস্থা বেগতিক বুঝে শিল্পায়ন প্রসঙ্গে *গণশক্তি*-র ১৯৮২-র শারদ সংখ্যায় জ্যোতি বসু অসহায়তা প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের নীতি যাই হোক না কেন তার পক্ষে নিজের উদ্যোগে কাজ করার ক্ষমতার অনেকটাই হাত পা বাঁধা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা পদ্ধতিতে রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব উদ্যোগ নেওয়ার অবকাশ খুবই কম রাখা হয়েছে। এমনকি রাজ্যগুলির স্ব স্ব উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের বা অগ্রাধিকার স্থাপনের সুযোগ নেই। আমাদের অভিজ্ঞতা হল এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ফলে একদিকে যেমন পরিকল্পনাগুলি ফলদায়ক হচ্ছে না, তেমনি অপরদিকে আঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টি করছে।....কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলে কিছু কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।' এরপরেও

শিল্পমহলে বিভ্রান্তি কাটাতে সিআইআই-এর সম্মিলন কলকাতায় করতে রাজ্য সরকারই প্রস্তাব দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও সিআইআই-এর সম্মিলনে বলেন, "In West Bengal, the left is right. And this is the right place to invest. (সূত্র : *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০০৫।) এতএব গা থেকে শিল্প বিরোধী কথাটা ঝেড়ে ফেলার একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে হয়েছে বাম সরকারকে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে পুঁজি টানতে গিয়ে শেষপর্যন্ত সিপিএম নিজের নীতি থেকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। ১৯৯১-এ দেশে উদারনীতি প্রচলনের পর রাজ্যে ১৯৯৪-এ নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। তারপর জ্যোতি বসু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিরুপম সেনদের বক্তব্য : 'গরিবের স্বার্থেই রাজ্যে দেশি-বিদেশি পুঁজি আনতে হবে ও লগ্নি করতে হবে। বিশ্ব বদলাচ্ছে। ভারত বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরাও নিজেদের পরিবর্তন করছি।' রাজ্যস্তরের অন্য নেতারাও বলেন 'পুঁজিবাদের স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রতিক্রিয়া আমাদের রাজ্যে ক্রিয়াশীল। শ্রমিক, কৃষক ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থে পুঁজিবাদী বিকাশ ত্বরান্বিত করাই কর্তব্য।'

১৯৬৪-তে দল গঠিত হওয়ার পর সিপিআই-এম ঠিক করেছিল 'জনগণের আশু সমস্যাবলী প্রশমনের এক বিনম্র কর্মসূচিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে মোর্চা জাতীয় কোনো সরকারে অংশ নেবে এবং বিপ্লবের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে সংসদে প্রবেশ করবে।' একই সঙ্গে তারা এটাও জানত যে, মৌল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান তারা করতে পারবে না এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয়। ১৯৭৭-এ রাজ্যের ক্ষমতায় এসে 'গরিবের সরকার' গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেও জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, এই ধরণের সরকার যদিও বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে না, তথাপি এমন কিছু সংস্কারমূলক কাজের উদ্যোগ নিতে ও সেগুলি রূপায়িত করতে পারে যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি সম্ভব এবং আরও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য জনগণের সংগ্রামে সেই কার্যধারা নিশ্চিত ভাবেই সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যেতে পারে।' এই হিসেবেই পুঁজিবাদী জমিদারি কাঠামোয় কৃষির উন্নতি ঘটাতে বামফ্রন্ট ভূমিসংস্কারকেই হাতিয়ার করে। কিন্তু তারপর প্রয়োজন ছিল জোরদার সমবায় আন্দোলন। কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্তকে শিল্পমুখী করে তুলে খেটে খাওয়া মানুষকে নিয়েই শিল্পায়নের একটি গণমুখী অভিমুখ তৈরি করা। একটি বাম সরকার ও পার্টির অবিরাম উদ্দেশ্য হলো বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মজবুত করে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। তার বদলে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে সিপিআইএম ক্রমশ কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক হয়ে যেতে থাকল। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তন সূচিত হওয়ার কথা, তাও শেষ পর্যন্ত দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার কেন্দ্র হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ভাবনাই প্রাধান্য পায়। মধ্যবিত্তরাই নেতৃত্বে থেকে গরিবের উন্নয়নে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে। বামপন্থী দর্শনে তা বলে না। সর্বহারা-গরিব শ্রেণির অর্থনৈতিক উত্তরণের জন্য ভূমি সংস্কার ছাড়া আর কোনো বিশেষ কার্যকর পথ পাওয়া যায়নি। এটা একটা বড়ো ব্যর্থতা। পরবর্তী-কালে স্বনিযুক্তি প্রকল্প, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বামফ্রন্ট বিকল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও সিপিআইএম শ্রেণি সংগ্রামের পথে না হেঁটে 'শ্রেণি তোষণে'-র দলে পর্যবসিত হয়, যার ফলে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বুর্জোয়া ভাবনাতেই সমাধান খোঁজায় প্রয়াসী হয়। তারই প্রতিফলন হিসেবে সিপিআইএম পুঁজির খোঁজে সিআইআই-এ গিয়ে বলতে শুরু করে 'Now left is right' ধীরে ধীরে পুঁজির গ্রাসেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে। সিন্দুর-নন্দীগ্রাম এপিসোড এই সত্তা হারানোরই ট্রাজিক পরিণতি।

বাম আমলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির তাগিদে ভূমিসংস্কারে অর্জিত কৃষির সাফল্য ধরে রাখার চেষ্টা ছিল, কিন্তু ভূমিসংস্কারও শেষ করা হয়নি মধ্যবিত্ত কৃষক নেতৃত্বের চাপে। সবচেয়ে বড়ো কথা। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আয়ে শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য ভাবে কমতে থাকে। নির্মাণক্ষেত্র, বিদ্যুৎ আর ইদানীং রিয়েল এস্টেট ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য পাওয়া যায় নি। উৎপাদনী শিল্পে লাগাতার অধোগতি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ার মতো। রাজ্যে ব্যাপক ভাবে রপ্তানিমুখী কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। সেটি নষ্ট হয় রাজ্য সরকারের স্পষ্ট নীতির অভাবে। শ্রম নিবিড় ছোটো ও মাঝারি শিল্পের ওপর জোর দেওয়ার কথা প্রতিটি নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল। তাতে কিছুটা বিনিয়োগ এসেছে। রাজ্যের মোট শিল্প বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই ১০০ কোটি টাকার মধ্যে। পাঁচ কোটি টাকার কম বিনিয়োগে তৈরি হয়েছে পাঁচশোর বেশি শিল্প সংস্থা। এই ক্ষেত্রটাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহৎ পুঁজি নির্ভর শিল্পায়নের পথই বামফ্রন্ট বেছে নিয়েছিল, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলনামূলক ভাবে সৃষ্টি হয় অনেক কম। 'ভাবনা আর কর্মের এই স্ববিরোধিতা রাজ্যের অগ্রগতিতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। জেলায় জেলায় শিল্প তালুক তৈরি করে সেখান থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। শিল্প তালুকও তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেখানে পরিকাঠামোর অভাব। লগ্নি করতে চায় না শিল্পপতিরা। কেন্দ্রের বঞ্চনা ছাড়াও ভুল শ্রমনীতি ও শিল্প সম্পর্কে তাত্ত্বিক মার্কসীয় অবস্থান নিয়ে গোঁড়ামির জন্য প্রথম দুটি মেয়াদে (১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সাল) বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে নি।

তৃতীয়বার সরকার গড়ার পর থেকেই শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ টানার জন্য বিশেষ ভাবে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় বামফ্রন্টের অন্দরে। জ্যোতি বসু বিদেশে যাওয়া শুরু করেন লগ্নির খোঁজে। কিন্তু খুব একটা সাফল্য আসে নি। আসলে শিল্পমহলের কাছে রাজ্যের ভাবমূর্তি 'শিল্পবন্ধু' হিসেবে ছিল না। তারা মনে করতেন শিল্প সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো উচিত। রাজ্যে আগে বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হওয়া দরকার। এক্ষেত্রেও কেন্দ্রের আমলারা খুব নেতিবাচক রিপোর্ট দিতেন। নানা সমস্যায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেসরকারি লগ্নি আসত অন্য রাজ্যের তুলনায় কম। □

দুর্বার ভাবনা

পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান যাঁরা সরাসরি আমাদের ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন বা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪
অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০ এই নম্বরে।

বৈধব্যের বিচারে সমাজ ও আইন

প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত রায়চৌধুরী

'সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জট পাকাইয়াছি। ... ... বালবিধবাকে চিরকুমারী করিয়া রাখা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে নিদারুণ ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কিনা ইহা আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় নহে। কিন্তু বহু প্রাচীনকালে সমাজের শিক্ষা, আচার ও অবস্থার একান্ত পার্থক্যের সময় কোন্ বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য। ... ... এমন বিপরীত বিকৃতি কেন ঘটিল।'
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সমাজ', ১৩০৫।

বিধবা বিবাহ : আজ আর কাল

বিধবা বিবাহ আইন পাশের দেড়শো বছর পার হয়ে গেছে। এই জুলাইয়ে একশো সাতান্ন বছরে পা দেবে। এতদিন পরে বাল্যবিবাহ-বালবিধবা প্রসঙ্গ কি মুছে গেছে! কেমন আছেন বিধবারা! তাঁদের পুনর্বিবাহ, মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার, 'সতী'-'অসতী' পরিচয় আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে!

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের গোসাবা ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত সাতজেলিয়া, লাহিড়ীপুর। প্রতি বছর বিধবা হন একাধিক নারী, বয়সের কারণে নয়, সাধারণ অসুস্থতা ছাড়াও বাঘের পেটে যাওয়া একটি নিয়মিত ঘটনা। 'বিধবা গ্রাম' 'বিধবাপল্লী' কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্যি না হলেও, মানুষের মুখের গল্পে সুপরিচিত। ২০১৩-র মার্চে বারো জেমস্‌পুরের বাসিন্দা গৌর বরকন্দাজের কথায় : 'এখানে বিয়ের বয়স এখনও ১৪ থেকে ১৭/১৮। ১৮ সরকারি আইন হলেও, আমাদের এখানে তা নয়। বালবিধবা আছে, কিন্তু বিধবা বিয়ের আইন নেই। জানি দেশের আইন বিধবার বিয়ে দিতে চায়। এখানে তা নয়।' যদি কেউ স্বেচ্ছায় সঙ্গী বেছে নেয়, এখনও 'মৃত স্বামীর ভাইরা তাকে সম্পত্তির পাওনা দেয় না, কোর্টে গেলে তারপরে রেহাই।' বিধবার নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই, সমাজ আমল দেয় না। আজও সংসারে থাকতে গেলে গীতা, আলাপী, হরিমতিদের কঠিন পরিশ্রমে, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে এক কোণে পড়ে থাকতে হয়। দেশের আইন কিভাবে অবহেলিত হয়েছে দেশেরই কোণে কোণে!

২০১৩-র দক্ষিণ ২৪ পরগণার গীতা মৃধার পাশাপাশি ফেলে দেখা যাক উনিশ শতকের বর্ধমান জেলার আদুরীর জীবনের আখ্যান। গীতার স্বামী গৌতম গেছে 'বাঘের পেটে', আদুরীর স্বামী গয়ারামের 'সাপে কাটা মৃত্যু'। গীতা যুবতী— আদুরী কৈশোর সবে পেরিয়েছে। গীতার নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে দুই নাবালক ছেলে। ঘরপোষা মুরগি, ছাগল, সরকারি প্রকল্পের কর্মী হিসাবে মাসে আড়াই হাজার টাকা রোজগার। আদুরী চাষি বাড়ির বউ। একান্নবর্তী সংসার। মা হওয়ার আগেই বৈধব্য এসেছে জীবনে।

আদুরীর কথা

১৮৭৪ নাগাদ লালবিহারী দে-র *গোবিন্দ সামন্ত* উপন্যাসের একটি চরিত্র, হিন্দু বিধবা আদুরী, বর্ধমানের কাঞ্চনপুর গ্রামের বাসিন্দা। আদুরী যখন বিধবা হলো তখন এদেশে বিধবা বিবাহ আইন বলবৎ। তবু হিন্দু পরিবারের বিধবা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তরুণ বয়স সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।' ... 'এ হচ্ছে কালো নৈরাশ্যের অন্ধকার'। বৈধব্যের বর্ণনায় 'একটানা মধ্যরাত্রি, ঊষার আলো কোনদিন তাঁর আঁধার দূর করবে কিনা কে জানে! হিন্দু বিধবা বোধহয় সবচেয়ে কৃপার পাত্রী।... প্রাণহীন দেহই সে কোনরকমে বয়ে চলে।... দুঃখটা তার নীরব। ...শাঁখা পলার বা রূপার অলঙ্কারপত্র ভেঙে ফেলে, পত্নীত্বের প্রতীক হাতের নোয়া, সীমন্তে সিঁদুর দেওয়া, পাড়যুক্ত শাড়ি কাপড় পরা— সবই বর্জন করে।... সংসারে বাস করেও তাকে থাকতে হবে সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ত।... আদুরী মনে করে সামাজিক জীবনে তার মৃত্যু ঘটেছে। সংসারে সে সত্য সত্যই একাকিনী।' পরবর্তীকালে এই আদুরীই শাশুড়ির সঙ্গে তীর্থযাত্রায় গেলে নবদ্বীপে তার দেখা হয় পূর্ব পরিচিত প্রেম বৈরাগীর। তারই ছলনায় আদুরী তার প্রিয় সঙ্গিনী হয় এবং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেয়। শাশুড়ি আদুরীকে হারিয়ে একা বাড়ি ফেরে। আদুরী নিঃসঙ্গতার বোঝা আর বইতে পারেনি, সঙ্গীর খোঁজে বৈষ্ণব সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৮৫৬-র বিধবা বিবাহ আইন গ্রামের বিধবা আদুরীর জীবনে কোনো কাজে লাগেনি।

এখানেই এসেছে 'সতী'-'অসতী'-র প্রশ্ন। বহু বিধবা নারী অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। সমাজ-সংসার আলোড়িত হয়েছে। শাস্ত্রীয় বিধান, নির্দেশ নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। গ্রামীণ সমাজের মানুষ ২০১৩-য় যখন বলেন অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে যে নারী তার মৃত স্বামীর পরিবার তাকে সম্পত্তির অধিকার দিতে চায় না, তখন মনে পড়ে উনিশ শতকের একাধিক রমণীকে, যাঁরা সম্পত্তির অধিকারের জন্যে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

সেদিন ছিল শাস্ত্র আর সত্যের লড়াই আর আজ সামাজিক বিধান আর আইনের বিরোধ!

কেরি কলিটনির মামলা

উনিশ শতকের শেষের দিকে কেরি কলিটনির সম্পত্তির অধিকারকে কেন্দ্র করে একটি মামলা হয়। তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, স্বামীর ভাই মণিরাম কলিটা কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। কেরি কলিটনির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি একজন ব্যভিচারিণী, তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না। (সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জনৈকা ব্যভিচারিণী প্রসঙ্গে'।) কেরি ছিলেন আসামের শিবসাগর অঞ্চলের মানুষ। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মৃত স্বামী গেন্ডেলার সম্পত্তি পান। সেই সূত্রেই এই মামলা। খুব সহজ

উপায় ছিল বিধবা রমণীর 'চারিত্রিক দুর্বলতা', 'নৈতিক অধঃপতন'-কে তুলে ধরে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা তাঁর স্বামীর সম্পত্তি করায়ত্ত করা। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশের মধ্যে সন্ধান করা হতো বিধবা নারী যাতে সম্পত্তির অধিকারী না হতে পারেন, তার পক্ষের যুক্তি। কেরি কলিটনির মামলায়, বিধবা অন্য পুরুষে আসক্ত হলেই যে তাঁর মৃত স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা পাবেন না, এ যুক্তি অপর যুক্তির কাছে হার মেনে যায়। কেরি কলিটনি বিবাহের পরিবর্তে 'ব্যভিচারিণী' হওয়ায় মামলায় জয়ী হন।

কেরির 'অসতী মোকদ্দমা' ধোপে টেঁকেনি। কিন্তু নারী যেখানে 'সতী' সেখানেও কেমনধারা ছবি পাওয়া যেত! সে সময়ে বহু বিধবা নারীর সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে সমস্যা ছিল; আজও আছে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পারতেন মামলা করতেন—আজও করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ভ্রষ্টা' অভিযোগে তাঁদের আজও অভিযুক্ত করা হয়।

বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মত ছিল হিন্দু বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবার পর যদি 'ভ্রষ্টা' হন তাহলে তিনি আর সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত ছিল বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবার পরে 'পতিতা' হলেও মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। (রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা দর্পণ* ২।)

নারীর অধিকার পিতা এবং শ্বশুর উভয় গৃহেই বারবার আহত হয়েছে। সেকালের এবং আজকের অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন পূর্বভারতে বাবা-মায়ের কাছে কন্যাসন্তান আদরণীয় ছিলেন কিন্তু তাহলে বাল্য বিবাহ ঘটল কেন, বালবিধবাদের পিতৃগৃহে এত অনাদর কেন! পিতা কেন কন্যার বিনিময়ে গণিকার পুত্রকে গ্রহণ করেন! নারীর বঞ্চনায় সমাজের অনুমোদন ছিল। সেই অনুমোদনই প্রশ্রয় দিয়েছিল পরিবারের কর্তাদের। আজও তাই নারীর ন্যূনতম ব্যাবহারিক 'দুর্বলতা' বা পরিবর্তনের অভিযোগ, তার অধিকারকে বারবার আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই বিকৃতির কারণ 'স্বাধীনতাতেই যে সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।' ('সমাজ'।)

ইতিহাসের কথা

একসময়ে সতীদাহ ছিল বৈধব্যের নিদান। স্বামী মারা গেলে তাঁরই চিতায় অংশ নিত স্ত্রী! ভালোবেসে নয়, স্বেচ্ছায় নয়, সমাজের ইচ্ছায়। এ ভাবে শেষ হয়েছে কত শৈশব, কৈশোর, যৌবন! আর সমাজ উল্লাসে, উৎসাহে ফেটে পড়েছে! 'সতী' বানাবার পুণ্যকাজে নিজেদের মহামান্য মনে করেছে! সতীদাহ সমাজের এমন গভীরে প্রোথিত ছিল যে রামমোহন রায়ও আইন করে এই প্রথাকে রদ করার বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রশাসনও প্রথম দিকে ঝুঁকি নিতে পিছুপা ছিল। পুরোনো নথি থেকে জানা যায়, সরকার ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ-বিষয়ে দেশের মানুষের স্বাভিমান এত বেশি ছিল যে তাঁরা তাকে আঘাত করতে ভয় পাচ্ছিলেন। ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সতীদাহ নিষিদ্ধ না হলেও, কলকাতা শহরে প্রথাটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তির যদি এ শহরে মৃত্যু হতো এবং তাঁর স্ত্রী সহমরণের ইচ্ছায় শহর ছাড়তে চাইতেন তাহলে তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটরা স্ত্রীর বয়স এবং অন্যান্য বিষয়ে খুব সাবধানতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। নচেৎ কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। (জুডিসিয়াল ক্রিমিনাল ফাইল—১৯, মার্চ ১৮১৯।)

বিধবা নারীর দায় এ ভাবেই সমাজ এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। নিজেরা যুক্তি সাজিয়েছেন, বাল্যবিবাহ ও কুলীন বিবাহের কারণে ছোটো ছোটো মেয়েরা বিধবা হয়, তাই সমাজকে ধরে রাখার স্বার্থে, নারী চরিত্র পবিত্র রাখার জন্য 'সতী' হওয়াই শ্রেয়। লক্ষণীয়, এঁরা কেউই বাল্যবিবাহ কিংবা কুলীন বিবাহের সমালোচনা করেননি।

অন্যদিকে বিধবা বিবাহের ইতিহাসে দেখা যায়, সতীদাহ বন্ধের আইন হওয়ার আগেও সমাজে বিধবা বিবাহের ইচ্ছা অনেক পরিবারে ছিল। আঠারো শতকে ঢাকার রাজবল্লভ সেনের বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহের চেষ্টা হয়। রাজবল্লভ সেন এই বিয়ের জন্য দ্রাবিড়, ত্রৈলঙ্গ, মিথিলা, কাশীর পণ্ডিতদের মতামত চাইলে তাঁরা নাকি মত দেন। এরপর নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের গোপন ষড়যন্ত্রে রাজবল্লভ সেনের মেয়ের বিয়ে হতে পারেনি। (রাধারমণ মিত্র, *ঐ*।) সে সময়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকলেও সমাজের কর্তাদের ইচ্ছা অনুসারে বিষয়টি আমল পায়নি। অবস্থা বদলাল। চালু হলো সতীদাহ নিবারণ আইন।

১৮২৯-এ আইন হওয়ার পর, অবস্থা বিশ্লেষণে দেখা যায় আড়ালে-আবডালে সতীদাহ ঘটলেও, সাধারণ ভাবে সংখ্যাটা কমছে। কিন্তু রয়ে গেছে বাল্যবিবাহ। ছোটো ছোটো বিধবা মেয়েতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। পরিবার-পরিজনের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকত তারা। সবাই পারত না। তাই অনেকে বেরিয়ে আসত পরিচিত পৃথিবী ছেড়ে, পা রাখত অজানা কোনো এক 'অসামাজিক' জগতে।

সমাজে আলোড়ন হয়। ১৮২০-তে রামামোহন রায় এবং ঊনিশ শতকের তিরিশের দশকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বিধবা বিবাহের সপক্ষে মতামত দেন। রামমোহন বুঝেছিলেন বিধবা বিবাহের সূত্রপাত না হলে সতীদাহ নিবারণের পর সামাজিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ১৮৩৭-এ ভারতীয় ল কমিশনে বিধবা বিবাহ হলে যে শিশুহত্যা ভ্রূণ হত্যা কমবে, সে বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন। ১৮৪০-এর দশকেও বিধবা বিবাহকে আইনত সিদ্ধ করার জন্য বিচ্ছিন্ন কিছু চেষ্টা হয়। কিন্তু সরকার হিন্দু রীতিনীতি এবং উত্তরাধিকার আইনের বিরোধিতা করতে চায়নি। কারণ তাতে হিন্দু স্বাভিমানকে আঘাত করা হতো।

অবশেষে ১৮৫৫-র ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর ৯৮৭ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি পিটিশন সরকারের কাছে দাখিল করেন এবং বিধবা বিবাহের প্রচারকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। যদিও রক্ষণশীল মহল থেকে আপত্তির ঝড় উঠেছিল তবু ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলো। এরপরেও জনৈক কুসুমকুমারী দাসীর আত্মহত্যা অনেককে ভাবিয়েছিল। বিধবা বিবাহের আইন হলেও বাল্যবিবাহ কুলীন বিবাহ প্রথা তখনও সমাজে রমরম করে চলচিল। কুসুমকুমারীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী হিসাবে যে চিঠিটি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়, তা হলো 'আমার ইচ্ছা নহে যে, আমি ভ্রষ্টা হই, জীবনে প্রয়োজন কি? হিন্দু ধর্ম অতি মন্দ যে ধর্মে বাল্য বিবাহ হয়!' কুসুমকুমারীর বিয়ে হয় সেই সময়ের নিরিখে বেশি বয়সেই ১৪ বছর ৫ মাসে, আর আত্মহত্যার সময় বয়স ছিল ১৮। (*সুলভ সমাচার*, ১৯ অক্টোবর ১৮৭৫।) তখন মেয়ের দিতে বিয়ে হতো ঋতুমতী হওয়ার আগে কারণ তারপরে বিয়ে হলে সমাজ তাকে নিন্দা করত। দেখা গেছে বৌয়ের বয়স যখন ৬, বর তখন চল্লিশোর্ধ ব্যক্তি। স্বাভাবিক ভাবেই বহু মেয়েই যৌবনের আগে বিধবা হয়। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর সংবাদপত্রে একাধিক বিজ্ঞাপন বেরোয় বিধবা মেয়ের পাত্রের সন্ধানে। বিষয়টি একদিকে যেমন সদর্থক, অন্যদিকে বাল্যবিবাহের নগ্ন দিকটি প্রকাশ পায়। বিয়ের বয়স এবং বৈধব্যের যোগাযোগ এক গভীর সামাজিক

সমস্যাকে তুলে ধরে। পাত্রীর বয়স ছিল ৬ মাস থেকে ১৫ বছর। কেউ কেউ ২ বছরে বিবাহিত হয়ে ৩ বছরে বিধবা হয়েছে। কুলীন বিবাহ, বাল্যবিবাহের চক্রে পড়ে কত মেয়ে যে জীবনের অধিকার পায়নি তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাই বিধবা বিবাহ চালু হওয়ার পরও বিদ্যাসাগরের মতো মানুষেরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। একজন বিধবা মায়ের ৬/৭ বছরের বিধবা মেয়ে চাঁপাতলার দিঘির কাছে থাকত— মা বিধবা বিবাহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে চাইলে বিদ্যাসাগর খুশি হননি। কারণ তখন তার শিক্ষা গ্রহণের বয়স। বেথুন স্কুলে তাকে ভর্তির উদ্যোগ নেন তিনি। (শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*।)

বিধবার বিবাহ কথা ও আন্দোলন

আইন রচনা হওয়ার পরে বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ দেন ১৮৫৬-র ডিসেম্বরে। পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পাত্রী কালীমতী দেবী। বিদ্যাসাগর একাধিক বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নেন। তার মধ্যে অন্যতম শিবমোহিনী দেবী। শিবমোহিনীর সঙ্গে বিয়ে হয় কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী চণ্ডীচরণ সিংহের। বিয়ে ছিল দোজবরে কিন্তু চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের প্রিয় পাত্র ছিলেন, তিনি ওঁকে অত্যন্ত সুনজরে দেখতেন।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে শুধু উদ্যোগ নেননি, প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন, একথা প্রায় সবারই জানা। বর্ধমানের রাজাও আর্থিক পুরস্কার এবং চাকরি বা কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাত্রদের বিধবা পাত্রীকে বিয়ের জন্য উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে বিয়ে দিতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা তাঁদের ছিল না। এই প্রচেষ্টার অন্য দুর্বলতাও ছিল। বিদ্যাসাগরের একটি উক্তির মধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে লীলাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'দেখ, বিধবা বিবাহ অনেক দিয়াছি। কিন্তু এদেশের পুরুষগুলি এমন বদ যে, অনেকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে ও পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। আর ঐরূপ বিবাহ দিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।' এরপর তিনি তিন আইন মতে 'রেজেষ্টরী' বিয়ের কথা বলেন। (চিত্রা দেব, *অন্তঃপুরের আত্মকথা*।) সংসারের চোখে 'ভালো' মেয়ে 'সতী' বিধবারাও সম্পত্তিজনিত কারণে শুধু বঞ্চিত হয়েছেন তা নয়, প্রতারিত হয়েছেন, পরিত্যক্ত হয়েছেন।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, এবং সাম্প্রতিক কালের গবেষণা থেকেও জানা যায়, ১৮৫৭-য় বেশ কয়েকটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১-তে বাংলাদেশের জনগণনা অনুযায়ী ০-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫০,০০০ ছিল হিন্দু বিধবা। ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ৯৩,০০০ এবং ২০-২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ৩,৭৬,০০০। ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৬ পর্যন্ত বিধবা বিবাহের সংখ্যা ৮০ ছাড়ায়নি। ১৮৮৯-এর মধ্যে মাত্র ৫০০ বিধবা বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। ১৯০৫-১৯২০ বিধবা বিবাহের আরেকটি ঢেউ আসে— তুলনামূলক প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে। সেই সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য। ('আ রিভিশনিস্ট অ্যানালিসিস অফ্ দ্য ফেলিওর অফ্ দ্য উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট অফ ১৮৫৬', একটি গবেষণাপত্র, ১৮৮১ জনগণনা।) প্রায় ৭০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ১৯৯০-তে কলকাতার যৌনকর্মীপল্লীগুলিতে একটি সমীক্ষা হয়। দেখা যায় ৭,০০০-এর মধ্যে ১০০০ জন বিধবা। আরও গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম থেকে আসা এই মেয়েদের মধ্যে অনেকেই আবার বালবিধবা। ('ডেভেলপমেন্ট ডায়ালগ'- কৃত সমীক্ষা।) সামগ্রিক ভাবে বিধবা বিবাহ 'আন্দোলন' আইনের জন্ম দিলেও সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এই আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেননি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সমাজ সচেতন ব্যক্তির ভূমিকাই ছিল প্রধান।

আইনের ত্রুটি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়

প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে পড়ে বিধবা বিবাহ আইনের দুর্বলতার কথা। বিধবাকে বিয়ের পর পুরুষের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে পরিত্যাগ করার সুযোগ আইনই করে দেয়। কারণ এই অবস্থা প্রতিরোধের কোনো উপায় আইনে ছিল না। তাই বালিকার মা-বাবারা খুব একটা উৎসাহ দেখাতেন না। দ্বিতীয়ত, আইনে বিবাহ অর্থাৎ রেজিস্ট্রির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার প্রবণতাও কাজ করেছে। ফলে বহু বিবাহের সুযোগ থেকে যেত। ফলে তা অপব্যবহারের অবিচারকে আইনি মান্যতা দিয়েছে।

বিধবা বিবাহ সফল না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো কুমারী বিবাহে পণের পরিমাণ ছিল বেশি কিন্তু বিধবা বিবাহে নয়। বিয়ের পাত্র যেমন সম্পত্তি, পণ বা বিধবার সন্তানের পিতৃত্বের অনিচ্ছার কারণে তাকে নিয়ে ঘর করতে চায়নি, ঠিক একই ভাবে পাত্রীর বাবা-মাও বিধবা বিয়ের সফল উদাহরণের অভাবে এবং সংস্কৃতিগত ও আইনের দুর্বলতার কারণে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি। আর দুই পক্ষের অনিচ্ছায় বিধবা পাত্রীর ইচ্ছা-পছন্দ ধোপে টেঁকেনি।

অনেক সময় যখন পাত্রী নিজের পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছেন, তখনও তিনি বিয়ের পথে না গিয়ে 'ব্যাভিচার'কেই প্রশ্রয় দিয়েছেন কারণ বিধবা বিবাহ আইন অনুযায়ী মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল না।

বিধবা নারীর জীবন কথা

শিবমোহিনী : শিবমোহিনীর প্রথম বিয়ে হয় ১০ বছর বয়সে। বিয়ের ২ বছর পর বিধবা হন। বাবার বাড়িতে ফিরে এলে বিমাতা তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেননি। শেমিজ ছাড়া এক কাপড় পরা, সিঁড়ির তলায় মাটিতে শোওয়া, নির্জলা উপবাসে একাদশী করা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা।

ইন্দুমতী : ইন্দুমতীর জীবন থেকে বোঝা যায় ঊনিশ শতকের শেষেও তাঁদের সম্পত্তির অধিকার থেকে কিভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সম্পত্তির ভাগ ছিল আট আনা। ভাসুরের বড়ো ছেলেকে ইন্দুমতী তাঁর বিষয়-আশয় দেখার ভার দেন। যদিও ছেলেটি তাঁকে বিষয় সম্পত্তি লিখে দিতে বলেছিল কিন্তু তিনি রাজি হননি। তাঁর মাসোহারা ছিল ২৫০ টাকা। তিনি পেতেন ৫০ টাকা, ২০০ টাকা নাকি জমা থাকছে! সংসারে আস্থা হারিয়ে ইন্দুমতী কাশীবাসী হন, সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসোহারা ঠিক হয় ১০০ টাকা। নায়েব মশাই আগাম ৪০০ টাকা হাতে দিয়ে বলেন বাকি সময়-মতো মানিঅর্ডার করবেন। এই 'আটআনির ছোটো তরফের জমিদারনি' শেষজীবনে একটা জানলা-বিহীন অন্ধকার ঘরে মিশনের সেবাশ্রমে দিন কাটিয়েছেন। কিছুই সম্বল ছিল না। বিনা পয়সায় থাকার ফলে যা বরাদ্দ ছিল তাই দিয়েই থাকতে হতো! পরনের দুটি কাপড় ছিল বরাদ্দ। তাই ছিঁড়ে যাবে বলে দিনের অধিকাংশ সময় উলঙ্গ থাকতেন।

জ্ঞানদাসুন্দরী : সাড়ে এগারোয় বিধবা হয়ে ৯৫ বছর বেঁচে ছিলেন। খিদে চেপে সংসারের নিয়ম মেনে কোনোমতে বেঁচে থাকা! রাঁধাবাড়ার বাইরে কোনো জগৎ ছিল না, কোনো ইচ্ছা ছিল না।

'বিধবাকে খেতে নেই, ছুঁতে নেই, দেখতে নেই, এই ছিল প্রতি মুহূর্তের বুলি। বিদ্রোহ না করুন, প্রশ্ন করবার সাহস ... ইচ্ছেও ছিল না। এমন নিরুদ্বেগ, এমন অনুত্তাপ ভাব মানুষের মধ্যে কমই দেখেছি।' স্বামী নেই, সংসারে নির্ভর করার মতো কেউ নেই। শুধু শরীরটুকু নিয়ে বেঁচে থাকা। প্রশ্ন নেই, রাগ নেই, হিংসা নেই। ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য নেই শুধু নয়, করতেও মন যায় না। জ্ঞানদাসুন্দরী এভাবেই সংসারের মধ্যে পাঁচজনের সঙ্গে বেঁচে ছিলেন। আত্মহত্যা করেননি, কুলত্যাগ করেননি, সঙ্গী খোঁজেননি।

উত্তমা দেবীর বিধবা ননদ : নিতান্ত শিশু বয়সে বিধবা। বড়ো হবার পরে বছর ৬/৭ বয়সে পেট ভরে ভাত খাবার চাহিদা তৈরি হলে তার মা মেয়েকে রোজ খাইয়ে দিতেন। অন্যদিকে ছেলেরা বসে খেত। একদিন ভাইরা প্রশ্ন করে 'তোর মাছ নেই?' মেয়ে মায়ের দিকে তাকালে মা ডালের বড়া দেখিয়ে বলেন 'এইটে তোমার মাছ'। এই অমানবিক ব্যবহার যুগে যুগে বালবিধবাদের সহ্য করতে হয়েছে। নিকট জনের বোধ হয়তো বলেছে যা হচ্ছে উচিত নয়, কিন্তু বিধান বলেছে এতেই 'পুণ্য'! ক্রমশ পূর্ণ বয়সে খিদে, ইচ্ছে যান্ত্রিক হয়ে গেছে। নিজের পছন্দে জীবন চালনা 'পাপ' বলে গণ্য হয়েছে।

বিধবা জীবনে ব্যতিক্রমী ভুবনমোহিনী : প্রায় একই সময়ে বয়স্ক স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীকে তাঁর অবর্তমানে সংসারে অন্য ভাবে রাখা হয়েছে। কর্তার মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুকালীন ইচ্ছাকে তাঁর ছেলে, ছেলের বৌ মর্যাদা দিয়েছেন, এই ঘটনাটি না বললে সত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ভুবনমোহিনীকে তাঁর স্বামী বিয়ে করেছিলেন নিজের পছন্দে। বয়সের অনেক তফাৎ ছিল। গরিবের মেয়ে, ছিলেন খুব আদরে। ছেলের বিয়ের কিছুদিন পরেই ভুবনমোহিনীর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ছেলেকে ডেকে বলেন '...তোমাদের মাকে আমি খুব ছোটটি ঘরে এনেছিলুম, ও বিধবা হলেও মাছ খেতে দিও, বন্ধ কোরো না। আমি নিজে শখ করে ওকে তামাক ধরিয়েছিলুম, তামাকটি দুবেলা খাবে ছাড়তে পারবে না।' ভুবনমোহিনী এভাবেই আমৃত্যু সংসারে ছিলেন। তাঁর নিজের বিচারে তিনি আচার পালন করতেন। (কল্যাণী দত্ত, *পিঞ্জরে বসিয়া*।)

ভুবনমোহিনীর মতো জীবন সবার ছিল না। আজও নেই। তাই তিনি ব্যতিক্রমী।

একুশ শতকের বৈধব্য

অপর্ণা লাহিড়ী : ১৪ বছরে বিয়ে। বিধবা হয়েছেন যৌবনে। আজ ৮০-উর্ধ্ব বৃদ্ধা। তাঁর জীবন আগের শতকের ধারাতেই চলছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত, পূর্ব কলকাতার বাসিন্দা। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারকে ধরে রাখতে বাইরেও বেরিয়েছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া বৈধব্যের বিচারে সমাজ তাঁকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন পরিসর দেয়নি। সেই শুচি থাকার প্রশ্নে দীক্ষা নেওয়া, সাংসারিক প্রয়োজনের বাইরে কোনো চাহিদা না থাকা, নিরামিষ খাওয়া এমনকি মুসুর ডালও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারে রাখা। সংসারও ভেবে রেখেছে মানুষটা মটরডাল, আলু সেদ্ধ আর রাতে দুটো রুটি ও অল্প দুধ খেয়ে বেঁচে থাকবে। নিরামিষের অভ্যাসে এখন আর আমিষের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না। প্রচণ্ড শীতে রাতে কাঁথা গায়ে দেন, গামছা পরে খালি গায়ে পুজো করেন। সন্তানদের বারণও এখন কাজে লাগে না। সব বাড়তি সুবিধাই তাঁর কাছে 'অশুদ্ধ'।

কৃষ্ণা চৌধুরী : ১৯৮৯-এ স্বামী প্রবীর কুমার চৌধুরী মারা যান। তিনি আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে থাকতেন। ৫৭ বছরের প্রায়-বৃদ্ধা নারী কৃষ্ণা চৌধুরীকে তাঁর দেওর গৃহ পরিচারকের ঘরে থাকতে বাধ্য করেন। জল, বিদ্যুৎ সব নিত্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। ২০০৩-এ অবস্থা সহ্যাতীত হওয়ায় তিনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড ও থানায় নালিশ জানান। এই ঘটনার পরিণতি জানা নেই। (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদ।)

গ্রামাঞ্চলে বিধবা বিবাহ যেমন প্রশ্নের অতীত, শহরাঞ্চলও মোটামুটি তাই। না হলে কাগজের পাতায় 'বিধবা মেয়ের পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন ব্যতিক্রমী ঘটনা হতো না। মনে করা হয় বিধবা হওয়ার পর মেয়েটির আর দ্বিতীয় বিয়ের আকাঙ্ক্ষা নেই। যৌবনেই জীবনের একটা দিক তার শেষ হয়ে গেছে। আজও!

যাঁরা বয়স্ক তাঁদের সাধারণ ভাবে সমস্যা আছেই কিন্তু বয়স্ক বিধবা সংসারে চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীন। কম বয়সে কর্মক্ষমতা দিয়ে মানিয়ে নিতে পারেন, আর উপার্জন থাকলেও অসুবিধা নেই কিন্তু বয়স্ক বিধবা! ২০১০-এর দুটি তথ্য পাওয়া গেল। বৃন্দাবন হয়ে উঠেছে কলকাতা সহ অন্যান্য বড়ো শহরের বিধবাশ্রম। ১৬,০০০ বিধবা ভিক্ষাবৃত্তি করেন সেখানে। সংসারে সকলের সঙ্গে যাঁরা থাকেন তাঁরাও মানসিক ভাবে এত পরমুখাপেক্ষী যে নিজেদের অধিকার বোধ তৈরি হওয়ারই সময় পায় না। তবু তারই মধ্যে দৃষ্টান্ত মূলক ঘটনা ঘটে। অত্যাচার অসহনীয় হওয়ায় বিধবা মাকে ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে হয়। ছেলে অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে মাকে ভাড়া করা ভিখারি পরিচয়ও দেয়! (সূত্র: সংবাদ মাধ্যম।)

শেষের দু-চার কথা

বিধবা বিবাহ আইন কুসুমকুমারীকে বাঁচাতে পারেনি। ইন্দুমতী, জ্ঞানদাসুন্দরীকে অন্য জীবন দিতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিধবা বিবাহ ছিল ব্রাত্য— বিদেশি শাসনে ও প্রশ্রয়ে একটি সামাজিক অনাচার। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশ স্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ণ করে। কারণ, বিধবার যদি সন্তানাদি থাকে তবে সেই সন্তানদিগকে হয় এক কুল হইতে কুলান্তরে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ তাহাদিগকে মাতৃহীন হইয়া থাকিতে হয়। সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবা রমণীকে পুরাতন ভর্তৃকুল হইতে নূতন ভর্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানা কারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধাজনক;... ('পরিশিষ্ট : সমাজ'।) তাই স্বামী হারানো রমণীকে প্রতিনিয়ত হতে হয়েছে বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়নের শিকার। সেদিনও। এখনও।

বিশ শতকে সম্পত্তি আইনে নারীর অধিকার, উত্তরাধিকার আইনে বিধবাদের অন্য নারীর সমতুল্য অধিকার দিলেও ঘটেছে কৃষ্ণা চৌধুরীর মতো ঘটনা। অপর্ণা লাহিড়ী আচারে-বিচারে এখনও বৈধব্যেই আটকে আছেন।

নারীর সম্পত্তির অধিকারের আইন এখনও বিধবা বোন, বিধবা পুত্রবধূকে শুধু থাকার অধিকার দিয়েছে। বসতবাড়ির পূর্ণ অধিকার এখনও নারীর নয়। স্বামী যদি কপর্দকহীন অবস্থায় মারা যান তাহলে স্ত্রীর দয়া ভিক্ষা ছাড়া অন্য আত্মীয়ের কাছে কোনো প্রাপ্য নেই। অন্যদিকে দরিদ্র বিধবা সমাজ সরকারি বিধবা পেনশন স্কিমে বাঁধা পড়ে আছে। তারই পাওয়া না পাওয়ার হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত সবাই। আইনি অধিকার, আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে মাথাব্যথা কম। এত না পাওয়া, এত অধিকারহীনতার মধ্যে আইন যে আদালতে একজন বিধবার আইনি লড়াইয়ের পরিসর বিস্তৃত করেছে, এটুকুই আশার কথা। পাশাপাশি সমাজ যদি আরেকটু মানবিক হতো! □

পুরাণকাল থেকে আজ ধর্ষণ রাজনৈতিক হাতিয়ার

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

আসুন, আমরা ধর্ষণের কথা বলি।

আসলে ধর্ষণ কোনো নতুন ঘটনা নয় যে এত কথা বলতে হবে। সকলেই জানেন ধর্ষণ কাহাকে বলে, কী ভাবে হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে, মানতেই হবে, ধর্ষণ ব্যাপারটার পৌরাণিকতা আছে। মুনি-ঋষি-দেবদেবীদের আমল থেকেই তা চলছে। পৌরাণিক ব্যাপার মাত্রেই কুলীন! তাই কি ধর্ষণ এ রাজ্যে বা দেশে মার্কেট পাচ্ছে? মার্কেট শব্দে রাগ করবেন না, প্লিজ। ধর্ষণকে কেন্দ্র করে কত কাগজ বাড়তি বিক্রি হচ্ছে, কত কত ঘণ্টা বেশি টিভি দেখছে, তাতে টিআরপি কত বাড়ছে, কত মোম বেশি বিক্রি হলো, কত কত নেতার গাড়ি ভর্তি 'সহানুভূতি' গেল, আবার কত নেতা প্রতিবাদী শব্দটাকে মাওবাদী বানালেন, কারা মিছিলে হাঁটলেন-কারা হাঁটলেন না— এই নিয়ে তর্কে গলা বসিয়ে ওষুধের দোকানে পকেট খালি করলেন— হিসাব করেছেন? করেন নি, যেমন করেন নি এই সব আর্য-নামধারী মুনি-ঋষি-দেবতাদের 'ধর্ষণে'-র ঘটনাগুলিরও।

অহল্যা-র নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, পরপুরুষ রামের স্পর্শে যিনি ফের নারীত্ব ফিরে পান। মহাভারতের কথা মিথ্যে হওয়ার নয়, গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যাকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র কামোন্মাদ হয়ে পড়েন। গৌতম মুনি রোজ ভোরে গঙ্গাস্নানে যেতেন। ইন্দ্র তার শিষ্য চন্দ্রকে একদিন বলেন, মাঝরাতে মোরগের ডাক ডাকতে। ভোর হয়েছে ভেবে গৌতম চলে যান স্নানে। ইন্দ্র সেই অবকাশে গৌতমের ছদ্মরূপ ধরে অহল্যাকে ধর্ষণ করেন। ইতিমধ্যে মুনি ফিরে এসে সব কিছু দেখে অভিশাপ দিলে ইন্দ্রের শরীরে সহস্র যোনি-চিহ্ন প্রকাশ পায়। পরে ইন্দ্রের অনুনয় বিনয়ে গৌতম ওই চিহ্নগুলিকে চোখে পরিণত করেছিলেন। রামায়ণের 'বালখণ্ডে'ই আছে এই কাহিনি। সেখানে বলা হয়েছে, গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডদ্বয় খসে পড়ে বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মেষের অণ্ড কেটে সেখানে সংযোজিত করেন। মুনির হাতের ধুতির আঘাতে চাঁদের গায়ে কালশিটে পড়ে এবং অহল্যা প্রস্তরীভূতা হন। রামের 'স্পর্শ' বিষয়টাও খুব জটিল। নারীকে ক্ষেত্র বলা হতো, সেই অর্থে পুরুষ লিঙ্গ হলো হাল। আর, যে ক্ষেত্র দীর্ঘকাল চাষ রহিত, তাঁকে অহল্যা বলা হয়। রমণীমোহন রাম কি তবে অহল্যাকে ধর্ষণ করেন নি?

ইন্দ্রের আরও কীর্তি আছে। রাজা পরিশথা-র স্ত্রী ভাবুস্থমাকে ধর্ষণের জন্যে তিনি পরিশথা-র অশ্বমেধের ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, যিনি এই যজ্ঞ করেন, আগের রাতে অশ্বমেধের সেই ঘোড়ার সঙ্গে যজ্ঞকর্তার স্ত্রীর মিথুন হয়। সেই অপরাধেই তো ঘোড়াটিকে বধ করা হয়। ইন্দ্র এ ভাবে ভাবুস্থমাকে ভোগ করেছেন।

দক্ষিণ ভারতের এক পুরাণ কাহিনিতে আছে শিবের ধর্ষণ কাহিনি। শিব একবার তারুগাভনম-এ গেছেন বিরুন্থাই ঋষির সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে ঋষির সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে মধ্যরাতে ধর্ষণ করেন। ঋষির অভিশাপে শিবের লিঙ্গ খসে পৃথিবীর বুকে পড়তে থাকে। দেবতারা প্রমাদ গোনেন, তাঁদের অনুরোধে পার্বতী সেই তিরের বেগে পতনশীল শিব লিঙ্গ নিজের যোনিতে ধারণ করেন। তাকেই আমরা 'শিবলিঙ্গ' বলি, জল ঢালি যা যোনিপ্রবিষ্ট লিঙ্গ। আবার দ্রোণের স্ত্রী কৃপীকেও উলঙ্গ করে শিব দ্বারা ধর্ষণের কাহিনি আছে।

দেবাদিদেব ব্রহ্মার কীর্তিও কম নয়। একদিন কামোন্মত্ত দেবাদিদেব কাউকে না পেয়ে জঙ্গলে এক মাদি ভালুককেই ধর্ষণ করেন। এটাই জাম্বুবন্ত বা জাম্বুবানের জন্মকথা। পুরাণে আছে, সরস্বতী (অন্য মতে পদ্মা)-র জন্ম দেন ব্রহ্মা। এই অর্থে সরস্বতী তার কন্যা। কিন্তু, মেয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই ব্রহ্মা তাঁকে ধর্ষণ করেন। এ নিয়ে দেবতারা ব্যঙ্গ করতে শুরু করলে লজ্জিত ব্রহ্মা নাকি ফের সরস্বতীর যোনিতে লিঙ্গ প্রবেশ করিয়ে নিজবীর্য প্রত্যাহার করেন এবং নিজেকেই অভিশাপ দেন যে, এই দোষে কোথাও ব্রহ্মার মন্দির স্থাপিত হবে না। সরস্বতীর কন্যা নিজের নাতনি দাক্ষায়ণীকে দেখেও তিনি স্বমেহন করেছেন। হরগৌরীর বিয়ের রাতে গৌরীর নগ্ন উরু দেখেও ব্রহ্মা রতিপাত করেন বলে শিব তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। বিষ্ণুকন্যা ঊর্বশীকে কল্পনা করে ব্রহ্মা স্বমেহনের পর তার স্খলিত বীর্য একটি কলসে (কলস = গর্ভ) রাখতেন। সেই কলস ফেটে জন্ম নেন অগস্ত্য মুনি।

মহাভারতের কথা অমৃতসমান। সেখানে পাই, রাবণ কুবেরের লঙ্কা দখল করার পর জোর করেই কুবেরের পুত্র নলকুবেরের স্ত্রী রম্ভাকে ধর্ষণ করেছে। আবার, বানররাজ বালী তার ভাই সুগ্রীবের সঙ্গে রাজ্যভাগ মেনে নিতে না পেরে সুগ্রীবের স্ত্রী রমাকে ধর্ষণ করেছেন। গড়ুরের বড়ো ভাই ছিল অরুণ। অপরূপ রূপের অধীশ্বর অরুণ একবার নারীর বেশে অরুণা হয়ে ইন্দ্রের রাজসভা দেখতে যান। ইন্দ্র তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। ফলে অরুণা গর্ভবতী হন, বালীর জন্ম দেন। ফেরার পর অরুণের দেরির কারণ শুনে সূর্য তাঁকে আরেকবার নারীর রূপ ধরার অনুরোধ করেন এবং তাঁকে ধর্ষণ করেন। সূর্যের ঔরসে অরুণার গর্ভে সুগ্রীবের জন্ম হয়।

পুরাণ মতে, সুন্দরী নারীর বেশে সজ্জিতা নারদকে ধর্ষণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তবে, নারদ রতিমোচন না করায় গর্ভধারণ করেন নি। সুন্দ-উপসুন্দ অসুরদের বধ করার জন্যে বিশ্বকর্মা তিলোত্তমার জন্ম দেন। ব্রহ্মা তাঁকে দেখে কামোন্মাদ হয়ে পড়লে তিলোত্তমা ভয়ে হরিণীর রূপ ধারণ করেন। তবু রক্ষা পাননি, ব্রহ্মা দ্বারা ধর্ষিতা হন। অন্য দেবতারাও একে পেতে নিজেরাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারেন, এই আশঙ্কায়

আশঙ্কিত বিশ্বকর্মা প্রমাদ গোণেন, বিশ্বকর্মা অভিশাপ দেন, তিলোত্তমা কোথাও এক মুহূর্তের বেশি স্থায়ী থাকতে পারবে না। অগ্নির পতিব্রতা পুত্রবধূর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছেন ব্রাহ্মণবেশী যমরাজ। বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে দিনের পর দিন চন্দ্র ধর্ষণ করায় জন্ম নেয় বুধ। রাজা ইলা পার্বতীর অভিশপে নারী হয়ে যান। বুধ তাঁকে ধর্ষণ করেন ও ১০ মাস পর সন্তানের জন্ম দেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্বর সঙ্গেও এমন কাহিনি জড়িয়ে আছে।

দেবগুরু বৃহস্পতির কীর্তি শুনুন। বৃহস্পতির দাদা উশিজের স্ত্রীর নাম মমতা। আসন্নগর্ভা স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে উশিজ কিছুদিনের জন্যে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। সেই সময় পূর্ণ গর্ভবতী মমতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ বৃহস্পতি মমতাকে বলেন, *'অলংকৃত্য তনুং স্বাং তু মৈথুনংদেহি মে শুভে।"* অর্থাৎ, সালঙ্কারে সেজে এস, আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব। ভীতা মমতা বললেন যে, তাঁর গর্ভে উশিজের সন্তান, যার প্রসব আসন্ন *'ন মাং ভজিতুমর্হসি'*। 'তুমি এই সময় মিলিত হতে পারো না। আমার গর্ভস্থ শিশুও সামান্য কেউ নয়। সে গর্ভে থেকেই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। বৃহস্পতি, আমি অনুনয় করে বলছি, তুমি অমোঘবীর্য, যা চাও তা হবেই, শুধু অনুরোধ করছি প্রসবের পরে তুমি যা চাইবে, তাই হবে।' কিন্তু, বৃহস্পতি আত্মসম্বরণের বদলে মমতাকে ধর্ষণে উদ্যত হলেন—*'ধর্ষমানঃ প্রসহৈনাং মৈথুনায়োপচক্রমে'*। বলপ্রয়োগ করে ধর্ষণে উদ্যত হতেই মমতার গর্ভস্থভ্রূণ কাতরকণ্ঠে বলল, *'নাবকাশ ইহ দ্বয়োঃ।'* অর্থাৎ, আমি তো আগেই এ-গর্ভে স্থান নিয়েছি। আপনার সঙ্গম তো কোনো মতেই ব্যর্থ হয় না, কিন্তু এই গর্ভে দুইজনের স্থান সংকুলান হবে না। একথা শুনে বৃহস্পতির বীর্যস্খলনে ব্যাঘাত ঘটল। চরম মুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃহস্পতি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, ''সমস্ত জীবের সুখাবহ চরম এই মুহূর্তে তুই যখন আমাকে বাধা দিলি, তাই তুই অন্ধকার নিয়েই জন্মাবি অর্থাৎ অন্ধ হবি।' এ ভাবেই চির অন্ধত্ব নিয়ে ঋষি দীর্ঘতমার জন্ম হলো। বৃহস্পতির বীর্য গর্ভে স্থান পেল না, পড়ল মাটিতে (ক্ষেত্রে? মানে, নারীর গর্ভেই? কে জানে। এ সব কাব্যে তো হেঁয়ালির শেষ নেই!) আর সেখানেই বৃহস্পতির বীর্য থেকে জন্ম নিল এক শিশু পুত্র। ধর্ষিতা মা মমতা শিশুটিকে নিয়ে বৃহস্পতির কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, ''*ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।*'' অর্থাৎ, 'এই জারজ সন্তানের ভরণপোষণের দায় বহন কর।'

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন আর্য সমাজে ধর্ষণ ছিল এবং ধর্ষণে জাত সন্তানের সামাজিক সম্মানও ছিল। হয়তো সমাজ এতটা জটিল ছিল না বলেই। তখন অন্য নারী অন্য পুরুষে গমন গর্হিত অপরাধ বিবেচিত হতো না বলেই রামায়ণ-মহাভারতে একের পর এক ক্ষেত্রজ সন্তানদের পাওয়া যায়।

তখন মুনি-ঋষিরাই ছিলেন সমাজের অভিভাবক, পরিচালক। তাঁদের কীর্তি বলেই হয়তো তাঁদের সাতখুন মাফই কেবল হয় নি, 'অমৃতসমান' বলেই আমাদের শেখানো হয়েছে। এখন যেমন রাজনীতিবিদরা হলেন সমাজ-পরিচালক, অভিভাবক। তারা ধর্ষণ করবেন, পুলিশ তাঁদের জনরোষ থেকে বাঁচাবে আর আমরা ফের তাঁদের নির্বাচিত করব। এই তো কালের নিয়ম হয়ে গেছে। নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে সমীক্ষা করে এমন একটি সংস্থা এডিআর জানিয়েছে, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এমন ১২ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ ছিল। তার মধ্যে দু'জন হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। মোট ৬ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা আছে বলে তারা নিজেরাই হলফনামা দিয়েছেন। আর সারা দেশে ৩৬৯ জন বিধায়ক ও সাংসদের বিরুদ্ধে নারী-নির্যাতনের মামলা আছে বলে নিজেদের দেওয়া হলফনামায় নেতারাই জানিয়েছেন। আর, দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে যে, এমন অভিযেগে অভিযুক্ত সাংসদ- বিধায়কদের নির্বাচন বাতিল করার অধিকার তাঁদের নেই।

২০০৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ায় নাবালিকা স্কারলেট কিলিংকে ধর্ষণ করে হত্যার পর এক রাশিয়ান মহিলাকে ধর্ষণের মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিল জন ফার্নান্ডেজ নামে এক মন্ত্রীর নাম। স্কারলেটের দেহ চার বছর তাঁর মা আগলে রেখেছিলেন বিচার পাওয়ার আশায়। শেষে হতাশ হয়ে গত বছর তাঁকে সমাধিস্থ করেছেন। আর, রাশিয়ান মহিলার মামলায় প্রমাণাভাবে নির্দোষ হিসেবে মুক্তি পেয়েছেন মন্ত্রীমশাই। আসামের নলবাড়ি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক বিক্রম সিং ব্রহ্মকে এ-বছর জানুয়ারি মাসে মহিলারা রাস্তায় ধরে গায়ের জামা খুলে নিয়ে মুখে আর বুকে বেদম পেটায়। কারণ, চিরাং-এর এক বাড়িতে সেই রাতে ছিলেন এই প্রবীণ নেতা। সেই বাড়িরই মহিলাকে সে রাতে তিনি আক্রমণ করে ধর্ষণ করেন। অতি সম্প্রতি কলকাতার উপকণ্ঠে এক মহিলা আইনজীবী পিয়ালী মুখার্জির সন্দেহজনক আত্মহত্যার ঘটনাকেও এই রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীর নাম জড়িত বলে খবরে এসেছে। ওই মহিলার সঙ্গে তাদের নিষিদ্ধ সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। তার মধ্যে মন্ত্রী মদন মিত্র-র ফোনে জীবনের শেষ ১০ দিনে ৭৫ বার পিয়ালী-র ফোন এসেছিল আর গিয়েছিল। কথা হয়েছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। পুলিশ কিন্তু একবারও সেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করার সাহস দেখায় নি। এর আগে উত্তর ২৪ পরগণার এক টিএমসি বিধায়ক দলের নেত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে দলেরই আরেক বাহুবলী বিধায়ক নেতার বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগ তুলেছিলেন।

গত কয়েক বছরে এমন অনেক ঘটনাই প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে ধর্ষণের সঙ্গে রাজনীতিবিদরা জড়িয়ে গেছেন। সিঙ্গুরে তাপসী মালিকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সিপিএমের নেতা দেবু মালিক সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধেই চার্জ গঠিত হয়েছে। নন্দীগ্রামে ২০০৭-এর মার্চ আর নভেম্বরে রাধারানি আড়ি সহ বহু নারী ধর্ষিতা হন। এটা কারও অজানা নয় যে, ওই দু'বার নন্দীগ্রামে হামলা আর গণধর্ষণের পিছনে সিপিএমের কর্মীরা প্রত্যক্ষ ভাবেই যুক্ত।

সব সময় রাজনীতিবিদরা যে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকবেন, তা নাও হতে পারে। বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের মন্তব্য বা উক্তি ধর্ষণকারীদের পরোক্ষ মদত দেয়। পার্ক স্ট্রিটে সুজেট জর্ডন নামের মেয়েটিকে ধর্ষণের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন 'সাজানো' ঘটনা। কাটোয়ায় ট্রেন থেকে এক বিধবা মহিলাকে প্রথমে ট্রেনের কামরায় পরে টেনে নামিয়ে ফের ধর্ষণে জড়িয়ে গিয়েছে যারা, তারা সবাই তৃণমূলের কর্মী। সেই ক্ষেত্রেও মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিকে লঘু করতে চেয়েছিলেন। নিউ ব্যারাকপুরে একটি মেয়েকে টেনে নেওয়ার সময় বাধা দিতে গিয়ে তাঁর মামা, যিনি পুলিশে চাকরি করতেন, খুন হন। মেয়েটি বার বার অভিযোগ করেছে যে, পুলিশ তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে না আর অভিযুক্তরা, যারা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত, প্রায়ই বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছে, বাড়ির বাইরে বোমা ফাটাচ্ছে। আর, বারাসাতে একটি মেয়েকে ধর্ষণের পর সেখানকার চলচ্চিত্র-শিল্পী বিধায়ক বলেছিলেন, মেয়েটি না কি ছোটো স্কার্ট পরে যাতায়াত করত। বিধায়ক মশাই তো চলচ্চিত্র শিল্পে এমন পোশাকে অনেককেই দেখেন, ধর্ষণের ইচ্ছে হয় কি না, বলেন নি।

এমন ঘটনা কেবল এই জমানাতেই হচ্ছে,

এমনটাও নয়। বানতলা-ধানতলার ঘটনা মানুষ এখনও ভোলেনি। বিরাটির রেল লাইনের পাশের ঝুপড়িতে এক মহিলাকে গণধর্ষণের পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ছিল, 'এমন তো কতই হয়' আর সিপিএমের মহিলা সমিতির নেত্রী বলেছিলেন, ওই মহিলার চরিত্র নাকি খারাপ ছিল।

অর্থাৎ, ক্ষমতায় যারা থাকেন, তাঁদের রং যাই হোক, তাদের কথাবার্তার ধরণটা একই রকম। রাজা আসে যায়, রাজা আসে যায়/ শুধু পোশাকের রঙ বদলায়/ শুধু মুখোশের ঢং বদলায়/ দিন বদলায় না। না হলে, যিনি ফেলানি বসাক নামে ফুটপাথ-বাসী এক মেয়েকে দিনের পর দিন ধর্ষণের পর গর্ভবতী করে ফেলার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে বিক্ষোভে বসেছিলেন, যাকে চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে সেদিন বার করে দেওয়া হয়েছিল বলে রাজ্য ফুঁসে উঠেছিল; তিনি তো আজ মুখ্যমন্ত্রী। ফেলানি বসাক কোথায়? যতদূর জানা যায়, ফেলানি সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তাঁর ভিখারি মা লোকলজ্জার ভয়ে শহরের উপকণ্ঠে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে ফুটপাথেই না খেয়ে একে একে তারা মরে গেছে। কোনো খবর হয়নি। চম্পলা সরদার এমনই আরেকটি নাম। সেই সময় বিরোধী নেত্রীর হাতের তুরুপের তাস। কাজ শেষ, তাসের প্রয়োজন শেষ। কারণ তিনি ক্ষমতায় আসার পর কিন্তু তাপসীর, রাধারানি আড়ির, চম্পলা সরদারের, ফেলানির ধর্ষণকারীরা শাস্তি পায় নি। রাধারানি তো ক্ষতিপূরণও পায় নি। উলটে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আর্জি জানাতে গিয়ে গলাধাক্কা খেয়েছেন।

আসলে, রাজনীতিবিদরা ধর্ষণকে হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করেন। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টেও বলা হয়েছে, ভারতে ধর্ষণকে 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। কোথাও দলিতদের বিরুদ্ধে, কোথাও সংখ্যালঘুদের দমন করার জন্যে, কোথাও প্রতিপক্ষকে সমঝে দিতে, কখনও বিরোধীদের শায়েস্তা করতে, নিজেদের দাপট বজায় রাখার জন্যে। আবার কখনও তুরুপের তাস হিসাবে, ক্ষমতাসীন দলকে চাপে রাখতে। কুবেরের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পর রাবণ যেমন কুবেরের পুত্রবধূকে ধর্ষণ করেন, তেমনই তাপসী, রাধারানি আড়িরা ধর্ষিতা হন। আর চম্পলা, ফেলানি, রাধারানি, তাপসীরা হন বিরোধীদের তুরুপের তাস।

প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখার, নিজেদের সর্বস্ব কায়েম করার, ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসাবেই ধর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই পুরাণের কাল থেকেই। এটাই পুরুষতন্ত্রের পরিচায়ক। ক্ষমতায় বসে থাকা ব্যক্তিটি পুরুষ কি নারী, তা নিয়ে কিছু এসে যায় না। তা না হলে, কারাগারে কখনও পুরুষ বন্দিও বা বিকৃত কামের শিকার হন কেন? পুরুষতন্ত্র মনে করে, নারীকেই দমন করে রাখতে হয়। শৃঙ্খলে বাঁধতে হয়। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যতজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তাঁর এক-তৃতীয়াংশ মনে করে জোর করে মেয়েদের যৌন সংসর্গে বাধ্য করার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই। তাঁদের ধারণা, মেয়েরা সেই সময় যৌন সংসর্গে 'না' বললেও সেটা নাকি আসলে 'হ্যাঁ' বলাই। তারা নাকি ধর্ষণকে 'উপভোগই করে!'

পুরুষতন্ত্র আজ সর্বত্র, সব প্রতিষ্ঠানে তার দখল কায়েম করেছে। ব্যাংক, সরকারি অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সংবাদ মাধ্যম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাকেন্দ্র—সর্বত্র। তাই কাজের জায়গায় নারী অসম্মান রোধে বিল করতে হয়। কারণ, বস থেকে সহকর্মী— সকলেই মনে করেন, কর্মরত মেয়েরা সহজলভ্য। তাদের প্রতি অশালীন ইঙ্গিত করা কোনো অপরাধ নয়। তাদের যৌন সংসর্গের প্রস্তাব দেওয়াই যায়। বিজ্ঞাপনে দাড়ি কামানোর উপকরণ বিক্রির জন্যেও নারীকে ব্যবহার করতে হয়। পুরুষদের ডিওডারেন্ট-এর বিজ্ঞাপনে পাশের বাড়ির মহিলাকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার চিত্র ভাবতে হয়। সরকারি চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্যে কোনো লাস্যময়ী অভিনেত্রীকে ব্যবহার করতে হয়। রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ও সরকারি মদতপুষ্ট আইপিএল-এ স্বল্পবাস 'চিয়ার গার্ল' লাগে। খেলার পর পার্টিতে চিয়ার গার্লদের নিয়েই চলে মদের ফোয়ারা!

এই পুরুষতন্ত্র আর বাজারতন্ত্রের অবসান না হওয়া পর্যন্ত ধর্ষণের মতো ব্যভিচার কমবে না। মূল্যবোধের প্রসার, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমতা-ভিত্তিক মানবতন্ত্রের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামই একমাত্র পথ। সেই লড়াইয়ে ধর্ষক ও ধর্ষণের সমর্থক রাজনীতিবিদদের প্রত্যাখ্যান করাটাও একটা জরুরি কাজ। □

দুর্বার ভাবনা

পাওয়া যাচ্ছে

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড) শিয়ালদহ স্টেশন (শানসাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়)
কলকাতায় : কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র) রাসবিহারী মোড়, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়)
ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে বইকল্প [দোতলায়]) বিধাননগর (উল্টোডাঙা) এবং
শিয়ালদহ-কল্যাণী শাখা ও শিয়ালদহ-বারাসাত শাখার বিভিন্ন রেল স্টেশনের বুকস্টলে ও অন্যত্র।

কলকাতার বাইরে

□ **পশ্চিম মেদিনীপুরে** ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড) □ **শান্তিনিকেতনে** সুবর্ণরেখা
□ **বাঁকুড়ায়** ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি প্রয়াস মল্লভূম □ **মালদহে** অমিত দাস পুষ্প নিউজ এজেন্সি
□ **কুচবিহারে** পার্থ লাহিড়ী, এইচ এন রোড □ **নবদ্বীপের** পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী □ **রায়গঞ্জে** ধানসিঁড়ি

যারা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান সরাসরি আমাদের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
অথবা ফোন করুন ০৮৪২০ ০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩ ২৫৪৩ ৭৫৬০

'বন্ধ করো না পাখা'

নারী নির্যাতন : সাম্প্রতিক প্রেক্ষিতে আইনি প্রতিরোধ

শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী

দিল্লির নাম না জানা মেয়েটি কয়েকদিন 'খবর' হয়েছিল। কর্পোরেট মিডিয়াগুলো দিচ্ছিল এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট, কে কত গভীরে যেতে পারে তার প্রতিযোগিতা। এর মাঝে কখন যেন মেয়েটা হয়ে উঠেছিল আপনজন। যেদিন সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে তার মৃত্যুর খবর বিভিন্ন চ্যানেল দেখাতে থাকে সেদিন কেঁদেছিল সারা দেশ। অথচ জাতীয় অপরাধ নিবন্ধীকরণ দপ্তর (National Crime Records Bureau)-এর দেওয়া সূত্র থেকে জানা যায়। প্রতি ২২ মিনিটে ১টি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে আমাদের দেশে। ১৯৭১ সালে যখন প্রথম নিবন্ধীকরণ শুরু হয়, সে বছর থেকে ২০১১ পর্যন্ত যৌন নির্যাতন বৃদ্ধির হার ৮৩৭ শতাংশ। সমীক্ষা বলছে প্রায় ৩৫ শতাংশ মহিলা শারীরিক বা যৌন হিংসার দ্বারা আক্রান্ত। এবং কম বয়সী মেয়েরা প্রথমে আক্রান্ত হয় তাদের নিকটাত্মীয়দের থেকে। আর কত কান্না পেরিয়ে আমরা নিরাপদ পৃথিবী গড়তে পারব? প্রশ্নটা জরুরি।

সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র নারী নির্যাতনের দিক নির্দেশ করে 'ঐতিহ্য' বা 'পরম্পরা' রক্ষার জন্য। উত্তর ভারতে 'খাপ পঞ্চায়েত' রাজস্থানের 'সতীপ্রথা' এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হলো এমনই কয়েকটি দৃষ্টান্ত। আমরা কর্মস্থলে নির্যাতনের একাধিক সংবাদ পাই। ইঁটভাটা শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিক, গৃহকর্মীরা কখনও তাদের সহকর্মী কখনও তাদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। কলকাতার উল্টোডাঙ্গাতে ঠিকা মহিলা শ্রমিকদের উপর একটি সমীক্ষা করা হয় *মন্থন সাময়িকী* পত্রিকার পক্ষ থেকে, তা থেকে জানা যায়— কর্মক্ষেত্রে বিনা পয়সায় ধর্ষণ-এর তুলনায় সোনাগাছি এলাকায় যৌনকর্ম তাদের রোজগার আনে বলে অনেকেই যৌন পেশা শুরু করেছেন। নারী নির্যাতনের এক বড়ো কারণ পণপ্রথা। এক্ষেত্রে শহর গ্রামের কোনো পার্থক্য নেই।

দেশের নাগরিক হিসাবে নারী নিপীড়নের প্রতিরোধে দেশীয় আইন কি বলছে তা জানা সময়ের নিরিখে আশু প্রয়োজন। আমরা জানি ১৯৬১ সাল 'পণ নিবারণ আইন' (Dowry Prohibition Act) তৈরি হয় পরে ১৯৮৬ সালে সেই আইন সংশোধনও (Amendment) হয়, কিন্তু পণের জন্যে বধূ হত্যা বন্ধ করা যায় নি। ২০০৬ সালে আসে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন। অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্যে যে সচেতনতার প্রয়োজন তার থেকে আমরা বেশ পিছিয়েই আছি। সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার ও জনসাধারণ সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আইনকে হাতিয়ার হিসাবে নিয়ে প্রতিবাদ করা যায়, কেননা অন্য পথে প্রতিবাদে 'মাওবাদী' আখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ভরসা অনেকদিন হলো গত হয়েছে। দিল্লির গণধর্ষণের পরে নাগরিক সমাজ পথে নেমে এসেছিল। দলহীন, নেতাহীন এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বার্তা দিয়েছিল নতুন আলোর। আরব দুনিয়ার 'বসন্ত বিপ্লব', আমেরিকার 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন' একই রকম ভাবে দেখিয়েছিল, ফেসবুকে বসা নতুন প্রজন্ম পথে নামতে জানে। বাংলাদেশেও 'শাহবাগ আন্দোলন' নতুন প্রজন্মের ডাকা আন্দোলন। নারী নির্যাতনে এই দেশে সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মেয়েরা বেশি শিকার হন। আদিবাসি মেয়ে সোনি সোরিকে 'মাওবাদী' সন্দেহে ছত্তীসগঢ়ের পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে। তার যৌনাঙ্গে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা ধর্ষণেরই নামান্তর। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁর মেডিকেল টেস্ট হয়। অসহায় এই মেয়েটি এখনও জেলে।

সুতরাং শৌখিন প্রতিবাদ নয়, বরং দেখা যাক আইনিপথে কিভাবে এগুনো যায়। প্রতিস্পর্ধার না হোক প্রতিশোধের আগুন না হয় আইনানুগ হোক।

জন্মের পূর্বে লিঙ্গ নির্ধারণ (প্রতিরোধ) আইন, (১৯৯৪)

[Pre-conception and pre-natal Diagnostic (Prohibition of sex selection) Act, 1994]

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজও আমদের সমাজে কন্যাসন্তানকে তার পিতা-মাতা দায় বলে মনে করেন এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে অনেক পিতা-মাতা কন্যাসন্তানের জন্ম দিতেই চান না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুযোগ নিয়ে জন্মের আগেই শিশু লিঙ্গ নির্ধারণ আজ কোনো আশ্চর্যের ঘটনা নয়, এবং কন্যাভ্রূণ চিহ্নিত হওয়ার পর তাকে হত্যা করার ঘটনা আমদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আকছার ঘটছে। এই প্রবণতা রোধে আমদের দেশে ১৯৯৪ সালে প্রবর্তিত হয়েছে জন্মের পূর্বে লিঙ্গ নির্ধারণ (প্রতিরোধ) আইন। এই আইনে ৬ নং ধারা অনুযায়ী জন্মের পূর্বে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আইনটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং সামাজিক সচেতনতার অভাব মূলত দায়ী।

পণ নিবারণ আইন (১৯৬১)

(Dowry Prohibition Act, 1961)

আইনের চোখে পণ চাওয়া, পণ নেওয়া, পণ দেওয়া, এমনকি পণ দেওয়া নেওয়াতে সাহায্য করাও অপরাধ। এই সকল অপরাধে দোষী ব্যক্তির ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাবাস এবং ১৫০০০ বা তার বেশি টাকা জরিমানা হতে পারে। এই আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে পণ দেওয়া নেওয়ার ঘটনা যথেষ্ট পরিমাণেই চালু আছে। অনেক সময় কন্যার পিতা বা অভিভাবকরা স্ব-ইচ্ছায় পণ দিয়ে থাকেন। তার কারণ হলো এই যে, আজও আমাদের দেশে কন্যা সন্তানের পিতা নিজের কন্যাকে 'দায়' বলে মনে করেন, একজন নারীর কাছে যা অত্যন্ত অপমানজনক। সব থেকে

দুঃখের বিষয় এই যে, এই পণ অনাদায়ে সংশ্লিষ্ট মহিলাটির উপর নেমে আসে নির্যাতন যা কোনো কোনো সময় হত্যা অবধি পৌঁছে যায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সাজা হয় না। আইনের ধারা অনুযায়ী বিবাহের সাত বছরের মধ্যে কোনো মহিলা অস্বাভাবিক ভাবে মারা গেলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে আদালত দোষী বলে অনুমান করে নেবে। সে ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে বাধ্য থাকবে। একজন নির্যাতিত বিবাহিত মহিলার হয়ে সেই মহিলা নিজে অথবা তাঁর বাবা, মা, ভাই, বোন, মাসি বা পিসি যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আদালত থেকে অনুমতি নিতে হবে।

বিবাহের পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলারা শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, ভারতীয় আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মহিলার যতদিন বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে ততদিন পর্যন্ত তিনি শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকারী। সুতরাং বিকল্প আশ্রয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত একজন মহিলার কখনই বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কাগজপত্র সই করা উচিত নয়। হিন্দু আইনের ১৮(১)(২) ধারা অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, অত্যাচার করে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে তাহলে স্ত্রী পৃথক ভাবে বসবাস করেও আজীবন ভরণপোষণ পেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আজীবন ভরণপোষণের অংশ হিসাবে স্ত্রীর আশ্রয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে।

একজন বিবাহিত মহিলা কোনো নির্যাতনের শিকার হলে যেমন দেওয়ানি আদালত থেকে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। তবে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করার আগে সবদিক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভেবে নেওয়া দরকার।

গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫

(The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

সারা ভারতের সাথেই ২০০৬ সালে এই রাজ্যে বিবাহিত নারীদের সুরক্ষায় গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনটি বলবৎ হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগ ও কার্যকারিতার দিক থেকে এই আইনের বাস্তব চিত্রটি খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। এর প্রধান প্রধান কারণ যা আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, তা হলো :

ক. পর্যাপ্ত বা সঠিক পরিকাঠামোর অভাব (উদাহরণ— উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দ নেই)।

খ. সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব।

গ. কোনো পৃথক আদালত না থাকায় এই আইনের আওতাভুক্ত মামলাগুলিও আর পাঁচটি মামলার মতোই বিবেচিত হয় ফলে বিচারের গতি শ্লথ হয়। যদিও আইন অনুযায়ী প্রথম শুনানির দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে।

ঘ. প্রোটেকশন অফিসারদের অত্যন্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাঁদের কাজে নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধনে আবদ্ধ এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন আদালতে ছুটে বেড়াতে হয়।

ঙ. আইনজীবী, পুলিশ, প্রোটেকশন অফিসার, বিচারপতি প্রভৃতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সমঝোতার অভাব।

চ. বেশিরভাগ আইনজীবীরা এই আইনের আওতায় মামলা দায়ের করতে অনাগ্রহী।

ছ. সকল বিচারক এই আইনটির খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন।

প্রথমেই জানা দরকার এই আইন অনুসারে গার্হস্থ্য হিংসার সংজ্ঞাটি কি— বা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোনো নিপীড়িত মহিলা আদালতের দারস্থ হয়ে সুবিচার পেতে পারেন।

১. কোনো কাজ যা বিবাহিত মহিলাটির স্বাস্থ্য, সুরস্থা, জীবন, ভালো থাকার ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয়েরই ক্ষতি করে অথবা মহিলাটির শারীরিক, যৌন, মৌখিক, আবেগ এবং আর্থিক হেনস্থার কারণ হয়।

২. কোনো কাজ যা কোনো অন্যায় চাহিদা পূরণ, পণ আদায় অথবা সম্পত্তি বা কোনো মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মহিলাটিকে হেনস্তা করে, ক্ষতি করে, আঘাতপ্রাপ্ত করে অথবা বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়।

৩. কোনো হুমকির কারণে মহিলাটি যদি শারীরিক বা মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

বিশেষ আইনি জটিলতায় না গিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে কোনো বিবাহিত মহিলার উপর যদি উপরোক্ত কোনো নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তাহলে তিনি এই আইনের আওতায় মামলা করতে পারেন। শুধু তাই নয় প্রতি জেলায় একজন করে প্রোটেকশন অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন এই বিষয়গুলি দেখার জন্য। যে কোনো নিপীড়িত মহিলা সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে তার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেও সুবিচার পেতে পারেন।

এ তো গেল ঘরের ভিতর একজন মহিলার প্রতি নির্যাতনের ধরণ এবং প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী সর্বদাই পুরুষের লোভ-লালসার নখরাঘাতের আক্রমণের থেকে সতর্ক থেকে চলাফেরা করলেও হামেশাই তাকে নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এই নির্যাতনের কুৎসিততম রূপ হলো ধর্ষণ।

কাকে বলে ধর্ষণ

ধর্ষণ আবহন করে আদিমতাকে এবং নস্যাৎ করে গর্বের সভ্যতার যাবতীয় মুখোশকে।

যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হতে বাধ্য করে তাকে ধর্ষণ বলে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, যদি কখনও মহিলাকে ভয় দেখিয়ে তার সম্মতি আদায় করে তাকে যৌন সংসর্গে লিপ্ত করা হয় তার সম্মতি গণ্য হবে না। একজন যৌনকর্মীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে যৌন সংসর্গে লিপ্ত করা আইনের চোখে ধর্ষণ বলেই পরিগণিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে একজন স্বামী তার স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করলে তা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে না। স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের কম হলে এবং স্ত্রী যদি স্বামীর থেকে আলাদা থাকে সে ক্ষেত্রে এটি ধর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পুরুষ-শাসিত সমাজে বহু ক্ষেত্রে একজন ধর্ষিতা মহিলা নিজে তার উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনা লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখে দিতে চান। কারণ, একজন ধর্ষিতা মহিলাকে সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই একঘরে করে দেওয়া হয়। কখনও কখনও সেই মহিলার দিকেই চরিত্র খারাপ ইত্যাদি অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করা যায় ২০০৩ সালে কুচবিহার জেলায় ঘোকসাডাঙ্গায় একজন মহিলা, শাসকদলের কর্মীদের দ্বারা ধর্ষণ হওয়র পর তৎকালীন সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত অনিল বিশ্বাস বিবৃতি দেন যে, 'মহিলাটির চরিত্র খারাপ ছিল।' অনুরূপ ভাবে ২০১২-য় পার্ক স্ট্রিটে একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কিছু মদ্যপ যুবক। পুলিশ মেয়েটির অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। মিডিয়ার মাধ্যমে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এলে তদন্ত শুরু না হতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারের বদনাম করতেই এই রটনা, কোনো ধর্ষণ হয়নি।' সরকারের ছোটো বড়ো মেজো সব মুখই সেই কথার প্যারোডি করে এবং সঙ্গে যোগ করে যে, মেয়েটির চরিত্র খারাপ

ছিল, অত রাত্রে পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে কি করছিল? ... ...' ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় কোনো মহিলার চরিত্র খারাপ বলে তাকে কখনও ধর্ষণ করা যেতে পারে না। এমনকি যৌনকর্মীদেরও তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনসঙ্গম করা যায় না। আর এরকম করা হলে তা ধর্ষণ বলেই গণ্য হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) প্রকাশিত 'যৌন-নির্যাতনের শিকার মহিলাদের জন্য চিকিৎসা ও আইনী সহায়তার নির্দেশিকা'-তে নির্যাতিতাদের পরামর্শ, গোপনীয়তা রক্ষা, নারীর চিকিৎসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ধর্ষিতার শরীরে ধর্ষণ বিষয়ক নমুনাদি সংগ্রহ থেকে ধর্ষিতার তাৎক্ষণিক প্রতিরোধক চিকিৎসা (Prophylaxis) সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

বলা বাহুল্য আমাদের দেশে এসব কিছু হয় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ভাবে যে সমস্ত সুবিধা থাকার কথা তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। যেমন— নির্যাতিতার মানসিক ও সামাজিক আঘাত ও অপমানজনিত ক্ষতের জন্য পরামর্শ আপৎকালীন গর্ভনিরোধ (Emergency Contraception) ব্যবস্থা, গর্ভাবস্থা ও এইচআইভি বিষয়ক পরীক্ষা ও পরামর্শ এবং যৌন সংসর্গের ফলে সংক্রমণের উপযুক্ত নির্ণয় ও শুশ্রূষা। বরং এখনও চিকিৎসকরা যে 'দুই আঙুল পরীক্ষা' (Two Finger Test) পদ্ধতির মাধ্যমে মহিলাটি ধর্ষিতা হয়েছেন কিনা তার পরীক্ষা করেন যা সর্বাংশে অবৈজ্ঞানিক। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক দেখেন ধর্ষিতার গোপনাঙ্গে যদি দুটি আঙুল স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে তাহলে তার প্রতিবেদনে লেখেন 'মহিলাটি যৌন সংসর্গে অভ্যস্ত'। একজন পারদর্শী সাক্ষী হিসেবে চিকিৎসকরা এই রিপোর্ট আদালতে পেশ করেন ও সর্বজন-সমক্ষে পাঠও করেন যা প্রায়শ একজন অবিবাহিতা ধর্ষিতার 'নৈতিকতার পতন' হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই শুধু প্রায়োগিক ক্ষেত্রেই এটি অবৈজ্ঞানিক তা নয়, একজন নারীর পক্ষে চরম অমর্যাদাকর এই পদ্ধতি। পদ্ধতিটি মান্ধাতার আমলের এবং নারীর তথাকথিত সতীত্ব তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র নির্ভর। লজ্জার কথা হলো আমাদের দেশে বেশির ভাগ চিকিৎসক এ ভাবে একজন ধর্ষিতার পরীক্ষা করে থাকেন ও আদালতও সেই মতো ধর্ষিতার চরিত্র হত্যা করতে নেমে পড়ে। এই অমানবিক পদ্ধতি এখনই বন্ধ হওয়া উচিত।

ধর্ষণের অভিযোগ এবং সে বিষয়ে থানা ও হাসপাতালের ব্যবহার বেশির ভাগ সময়ে প্রভাবিত হয় ধর্ষিতার জাত, শ্রেণি, গ্রামীণ ভিত্তি ইত্যাদির নিরিখে। ধর্ষণের পর অসহায় মেয়েটি সমাজ, থানা, হাসপাতাল, আদালত, মিডিয়া সর্বত্র থেকে যে অভিজ্ঞতা পান তা কোনো অংশে তার তিক্ত অভিজ্ঞতার থেকে কম নয়। তাঁকে বারবার ধর্ষিত হতে হয়। তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা যাদের ব্যক্ত করেন অর্থাৎ পুলিশ, মুখ্য চিকিৎসক আধিকারিক (Chief Medical Officer), স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ এবং কখনও ফরেনসিক চিকিৎসক প্রায় সকলেই পুরুষ। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্ষিতার পক্ষে তাদের কাছে স্বচ্ছন্দে সব কিছু বলা লজ্জাজনক হয়ে ওঠে।

ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী একজন ধর্ষণকারী সাত থেকে দশ বছর পর্যন্ত সাজা পেতে পারে। ধর্ষণের মামলায় ডাক্তারি পরীক্ষা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

ধর্ষণ হওয়ার পর একজন মহিলা এবং তার পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি সতর্কতা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। যেমন ডাক্তারী পরীক্ষার আগে সেই মহিলার কখনই স্নান করা উচিত নয়। ধর্ষণের সময় পরিহিত পোশাকও ধোওয়া উচিত নয়। ধর্ষিতার শরীরের বিভিন্ন চিহ্ন এবং পোশাক তাঁর উপর ঘটা অত্যাচারের একটি বড়ো প্রমাণ।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের বিভিন্ন রকম হেনস্তার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৯৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিশাখা মামলার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি নির্দেশিকা চালু হয়। ইটখোলার আর্থিক ভাবে প্রান্তিক মহিলা তথা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলা— কেউই এর ব্যতিক্রম নন। উক্ত আইন প্রণয়ন কর্মরতা মহিলাদের কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করলেও আজও বেশির ভাগ মহিলা কর্মক্ষেত্রে এই হেনস্তার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ নন।

ভারতের সম-মজুরি আইন, ১৯৮৬ অনুযায়ী একজন মহিলা একই কাজের জন্য একজন পুরুষের সম-মজুরি পাওয়ার অধিকারী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, একজন কর্মদাতা একজন মহিলাকে দিয়ে সবরকম কাজ করতে পারেন না। যেমন একজন মহিলাকে কোনো অবস্থাতেই নির্ধারিত ওজনের অধিক (কারখানা ব্যতিরেকে ভিন্ন) পরিমাণ তোলবার আদেশ দিতে পারেন না, কোনো চলন্ত যন্ত্রে তেল দেওয়া বা মোছার কাজ করাতে পারেন না।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন মহিলা প্রসূতিকালীন কিছু সুবিধার অধিকারী। সন্তান জন্মের ৬ সপ্তাহ পূর্বে এবং পরে তিনি ছুটি পাওয়ার অধিকারী। গর্ভপাত হলেও এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

ভারতীয় সংবিধান এবং নারী

ভারতীয় সংবিধান তার মুখবন্ধ, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং নিয়ামক নীতিমালার লিঙ্গ সাম্য নীতিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। সংবিধানের নিম্ন লিখিত অনুচ্ছেদগুলি নারীর অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে।

- আইনের চোখে সকলে সমান। [অনুচ্ছেদ ১৪]
- রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে ধর্ম বর্ণ জাতি লিঙ্গ জন্মস্থানের কারণে অথবা কোনো একটির নিরিখে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। [অনুচ্ছেদ ১৫(১)]।
- নারী ও শিশুদের জন্য রাষ্ট্র যে কোনো বিশেষ অনুবিধি রচনা করবে [অনুচ্ছেদ ১৫(৩)]।
- প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি কার্যালয়ে নিয়োগ বা নিযুক্তির ক্ষেত্রে সম অধিকার থাকবে। [অনুচ্ছেদ ১৬]
- জীবিকার বিশদ অর্থে নারী ও পুরুষ যাতে নির্বিশেষে সম-অধিকার লাভ করতে পারে তা সুরক্ষিত করতে রাষ্ট্রকে দিক নির্দিষ্ট করতে হবে [অনুচ্ছেদ ৩৯ (ক)] এবং সমান কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর সমান পাওনাকে সুরক্ষিত করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৩৯ (ঘ)]।
- কাজের পরিসরে রাষ্ট্রকে পক্ষপাতশূন্য ও মানবিক পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মাতৃকালীন নিবৃত্তি (Maternity relief)-র ব্যবস্থা করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ৪২]
- রাষ্ট্র দুর্বল শ্রেণির মানুষ (নারী সেই শ্রেণিতে পড়ে)-এর শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করতে বিশেষ যত্নবান হবে এবং তাদের সামাজিক অবিচার এবং শোষণ থেকে রক্ষা করবে। [অনুচ্ছেদ ৪৬]

এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৩ নারীকে বিশেষ অধিকার দিয়েছে।

বিভিন্ন আইন এবং নারী

সাংবিধানিক অনুশাসনকে তুলে ধরতে রাষ্ট্র একাধিক আইনী ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে সামাজিক বৈষম্য ও নারীর ওপর ঘটে যাওয়া একাধিক ধরণের

ফৌজদারী কার্যবিধি (Criminal Proceedure Code)

আইনের ধারা	অপরাধের স্বরূপ	সাজার পরিমাণ
৩৫৪	(নারীর সম্মানে আঘাত করা)	২ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুটোই
৩৬৬	(নারী অপহরণ ও তাকে বিবাহে বাধ্য করা)	১০ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা
৩৬৬ (ক)	(বিদেশ থেকে মেয়ে আমদানি করা)	১০ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা
৪৯৮	(কোনো অপরাধের উদ্দেশ্যে কোনো বিবাহিত মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়া বা আটকে রাখা	২ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুটোই
৪৯৮ (ক)	(বিবাহিত মহিলার উপর তার স্বামী/এবং অথবা তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন)	৩ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা
৪৯৪	(বিবাহিত স্ত্রীর বর্তমানে তার স্বামীর আবার বিবাহ করা)	৭ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা
৪৯৭	(ব্যভিচার)	৫ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুটোই
৫০৯	(কোনো শব্দ, আরচণ অথবা ব্যবহার দিয়ে কোনো মহিলাকে অপমান বা সম্মানে আঘাত করা)	১ বছরের কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা দুটোই
ধারা ১২৫	উপার্জনে অক্ষম বিবাহিত নারী, সন্তান এবং অভিভাবক (বাবা-মা) আদালতে খোরপোষের দাবি করতে পারেন যদি স্বামী/পিতা/ছেলে ভরণপোষণে অস্বীকার করে।	
ধারা ৪৬ (৪)	কোনো মহিলাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে গ্রেফতার করা যাবে না। যদি কোনো বিশেষ কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সূর্যাস্তের পরে কোনো মহিলাকে গ্রেফতার করার দরকার পড়ে তবে তা একজন মহিলা পুলিশ অধিকারিক, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে গ্রেফতার করতে পারবেন।	
ধারা ৫২ (২)	কোনো মহিলাকে কেবলমাত্র একজন মহিলাই তল্লাসি করতে পারবেন।	
ধারা ১৬০ (১)	কোনো পুলিশ অফিসার কোনো মহিলাকে থানায়, ফাঁড়িতে বা পুলিশের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারেন না।	

নির্যাতন ও হিংসাকে মোকাবিলা করা যায়। ভারতে নরীর ওপর অপরাধকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১.

ভারতীয় দণ্ডবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট অপরাধ

ক. ধর্ষণ (ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৬)।
খ. বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অপহরণ এবং বলপূর্বক অপহরণ (ধারা ৩৬৩-৩৭৩)।
গ. বরপণের জন্য হত্যা, মৃত্যু বা এসবের প্রচেষ্টা (ধারা ৩০২/৩০৪ খ)
ঘ. শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন (ধারা ৪৯৮ ক)।
ঙ. শ্লীলতাহানি (ধারা ৩৫৪)
চ. যৌন নিগ্রহ (ধারা ৫০৯)
ছ. নাবালিকা পাচার (২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত)

২.

বিশেষ আইন দ্বারা নির্দিষ্ট অপরাধ

এই সব আইনের মধ্যে লিঙ্গ নির্দিষ্ট কিছু না থাকলেও নারীর অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি জড়িত, যেমন —

ক. কর্মচারী রাজ্যবিমা আইন, ১৯৪৮
খ. বাগিচা শ্রমিক আইন, ১৯৫১
গ. পারিবারিক আদালত আইন, ১৯৫৪
ঘ. বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪
ঙ. হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫

সম্পত্তির অধিকার

১৯৩৭ সালের The Hindu women right property act. 1937-এর আগে কোনো লিখিত আইন না থাকায় নারীর সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে একটা ধোঁয়াশা ছিল। ওই আইন চালু হওয়ার পর নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কিছুটা জানা যায়। যেমন এই আইনটিতে বলা হয়— একজন বিধবার তাঁর স্বামীর সম্পত্তির উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যেটিকে Hindu Widows estate হিসেবে গণ্য করা হবে। The Hindu Succession Act, 1956, এর ১৪ নং ধারানুযায়ী—

১. প্রত্যেক নারী Absolute Owner হিসেবে সম্পত্তির প্রতি তাদের পূর্ণ অধিকার অর্জন করবে।
২. নারীর পূর্ণ অধিকার আছে যে কোনো সম্পত্তি ভোগ করার absolute Owner হিসাবে।

৮ নং ধারা অনুযায়ী, একজন নারী তখনই বাড়ির অংশীদার হিসাবে গ্রাহ্য হবে। যখন সেই নারী উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যা হবেন এবং সে যদি অবিবাহিত বা বিধবা কিন্তু তাঁর স্বামীর দ্বারা প্রত্যাহৃত হন।

নারীর গর্ভপাতের অধিকার

(Right of Women to Terminate Pregnancy)

গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে বিতর্ক আছে। নারীর অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে বিচারকরা তাঁদের অসংখ্য রায় দানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদ জীবনের ও স্বাধীনতার অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে। সর্বোচ্চ আদালত, সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসাবে অনুচ্ছেদ ২১-কে ব্যাখ্যা করে ব্যক্তির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উদাহরণ—

খড়ক সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য মামলা। প্রজননের ও প্রজননক্ষম অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের অধিকার জন্ম দেয় অন্য এক অধিকারের, তা হলো গর্ভপাতের অধিকার। বাস্তবে ভারতে তা হয় না। গর্ভস্থ শিশুর জন্মের বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে মহিলার স্বামী অথবা তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মহিলাটির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এ দেশে ভ্রূণকে স্বামীর সম্পত্তি হিসাবে দেখা হয়।

অথচ সংশ্লিষ্ট আইন (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 - MTPA) স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে গর্ভপাত সম্ভব, এ কথা বলে না। MTP আইন অনুযায়ী এজন মহিলা নিম্নোক্ত অবস্থায় তাঁর গর্ভবস্থাকে সমাপ্ত করতে পারেন :

১. যদি গর্ভাবস্থা মায়ের ক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয়।

২. যদি ভ্রূণ প্রতিবন্ধী হয়।

৩. গর্ভাবস্থার কারণ যদি ধর্ষণ হয়।

৪. গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা যদি অসফল হয়।

তবে ১৮ বছরের নীচে বা মানসিক ভারসাম্যহীন কোনো মহিলার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি প্রয়োজন।

১৮ বছরের ঊর্ধ্বে (বিবাহিত বা অবিবাহিত) যে কোনো মহিলার গর্ভপাতের অধিকার আছে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই।

সমস্যা হলো ভারতে গর্ভপাতের অধিকার বিষয়ে আদালতের সরাসরি কোনো ঘোষণা নেই। বরং আদালত MTP-র উল্লিখিত প্রেক্ষিতগুলো উপেক্ষা করে ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code বা IPC)-কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। সম্প্রতি দিল্লি আদালত একজন বিধবাকে সমন জারি করে তার গর্ভপাতের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে MTP আইনকে নস্যাৎ করে গর্ভপাত ঘটায় অথবা কোনো মহিলা যদি নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটান এবং তা যদি প্রসূতির জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে, তবে তাদের, তার অনধিক ৩ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হবে। শীঘ্র সন্তান সম্ভবার ক্ষেত্রে ৭ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

শুধু আদালত নয় ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১২ ধারা গর্ভপাতের অধিকার বিরোধী, যা একই সঙ্গে নারীর মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬

(Prohibition of Child Marriage Act, 2006)

এই আইনে শিশুর বয়স ধার্য করা হয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর। যদি কোনো ব্যক্তি শিশুর (ছেলে অথবা মেয়ে) বিবাহের উৎসাহ বা অনুমতি দেন তাহলে তিনি উক্ত আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হবেন। অপরাধী ব্যক্তিকে সর্বাধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হতে পারে।

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

একজন হিন্দু বিবাহিত নারীর তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করার অধিকার আছে বিভিন্ন কারণে যেগুলি হিন্দু বিবাহ আইনের (১৯৫৫ সালে) ১৩ নং ধারায় নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা আছে। মুসলিক মহিলাদেরও 'ডিসল্যুইশন অফ মুসলিম ম্যারেজ' (১৯৩৯) আইনের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)।

দুর্বার প্রকাশনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

অধিকার ভাবনা সম্পাদনা : **শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও স্মরজিৎ জানা** দাম : ৮০ টাকা

নারী ভাবনার বাইশ কথা সম্পাদনা : **তরুণ বসু ও ভারতী দে** দাম : ১০০ টাকা

চেনা দেশ অচেনা মানুষ **স্মরজিৎ জানা** দাম ২০০ টাকা

ভিন্ন নারী অন্য স্বর **তরুণ বসু** দাম ৪০ টাকা

সমাজ সমস্যার সাতসতেরো **স্মরজিৎ জানা** দাম ১৯৫ টাকা

কখনও জিত কখনও হার সম্পাদনা : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত** দাম : ৩০০ টাকা

ONLY RIGHTS CAN STOP THE WRONG Rs 50.00

BABUDER ANDAR MAHAL **Mrinal Kanti Datta** Rs 50

পাওয়া যাবে :

দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ।

এ ছাড়াও কলেজ স্ট্রিটে দে বুক স্টোর, মণীষা গ্রন্থালয়। মেদিনীপুরে ভুর্জপত্র। শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা। ও অন্যত্র।

গরমে ঠান্ডা থাকা

জে বি এস হলডেন

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক জন বারডন স্যাণ্ডারসন হলডেন (১৮৯২-১৯৬৪)-এর *Science and Indian Culture* বই হয়ে বেরিয়েছিল ১৯৬৫-তে অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরে। এই বই-এ অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি অধিকাংশই লেখা ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন যখন। সে-সময় এ-দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন। দেখতে ছোটো অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আগ্রহ দেখা যায় নি বড়ো একটা। এই 'গরমে ঠান্ডা থাকা' তাঁর লেখা 'Keeping Cool' প্রবন্ধটির অনুবাদ। (অনুবাদক : **তরুণ বসু**।) মূলত সাধারণ মানুষ প্রবল গরম থেকে কি ভাবে রক্ষা পেতে পারেন সেই ব্যাপারে একটা বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা এই লেখা। — সম্পাদক

... ১৯৫৮-য় উত্তর ভারতে সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছিল। বর্ষা এসেছিল দেরিতে। সঙ্গে এনেছিল ঠান্ডা বাতাস। কিন্তু বাংলায় বর্ষায় যতটুকু ভাগ আমরা পেতাম তা আর পাব না। কারণ আবহাওয়া আবারও বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তবে আমি যেখানে কাজ করি সেখানে অবশ্য ঘর ঠান্ডা রাখা এমন কিছু বিরাট সমস্যা নয়। আমাদের ঘরে যথেষ্ট সংখ্যায় ইলেকট্রিক পাখা লাগানো আছে। আর সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটের মধ্যে ঘরের বাইরে তো আমায় বেরোতে হয় কদাচিৎ। কিন্তু আমার স্ত্রী এমন একটা ক্লাসে পড়ান যেখানে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের অতি ক্ষুদে আর জ্যান্ত কীটপতঙ্গ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। তখন যদি তাদের মাথার 'পরে পাখা ঘোরে বা বেশ জোরে হাওয়া বইছে এমন দিনে দরজা-জানলা খোলা থাকে তাহলে ওই ক্ষুদ্র পোকামাকড়গুলো উড়ে পালাবে। এ-কারণে আমার স্ত্রী ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা থাকতে বাধ্য হয় একটা বদ্ধ ঘরে— প্রবল গরমের দিনেও— এক্কেবারে সাধারণ মানুষরা যেমন থাকেন।

ইংলন্ডে খনি আর কলকারখানায় যথেষ্ট আলো-হাওয়ায় ব্যবস্থা করার জন্যে যখন চিন্তাভাবনা শুরু হয় সে-সময় গরমের দিনে ঘর ঠান্ডা রাখার ব্যাপারেও বিস্তর আলাপ-আলোচনা করা হয়। এর বাইরে আর এ-বিষয়ে তেমন ভাবনা-চিন্তা হয় নি। যদিও, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে এই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে বলে আমেরিকা দাবি করবে, কিন্তু এই ব্যবস্থা যেমন বড়ো বেশি খরচ সাপেক্ষ তেমনি শরীরের পক্ষেও অনেক সময় সুখকর নয়। কারণ, যে-মুহূর্তে কেউ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বাইরে আসবে সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে পড়তে হবে প্রবল গরমের মধ্যে। যাই হোক, ভারতেও এ-বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার সময় হয়েছে। আমরা জানি, ইংলন্ডের লোকেরা— যদি তাদের পছন্দ করার মতো সুযোগ থাকে— তাহলে কী ধরণের আবহাওয়া তারা পছন্দ করবে। আর আমরা এও জানি যে, কোন্ তাপমাত্রায় কিছু কিছু কারখানায় দুর্ঘটনার মাত্রা একেবারেই কমে যায়। আর এই দুর্ঘটনার মাত্রা আবার বেড়ে যায় ১৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশি বা কম তাপমাত্রায়। যেমন উচ্চ-তাপমাত্রা শ্রমিকদের করে তোলে অলস আর ঘুমকাতুরে; আবার নিম্ন তাপমাত্রায় তাদের হাতের আঙুলগুলো পর্যন্ত অসাড় হয়ে পড়ে, ফলে তাদের কাজকম্মও মাথায় ওঠে। তাই, যদি তাদের তাপমাত্রা পছন্দ করতে বলা হয় তাহলে সাধারণ ভাবে তারা পছন্দ করবে সেই রকম তাপমাত্রা যে-তাপমাত্রায় দুর্ঘটনার হার সবচাইতে কম বা একেবারেই ঘটে না বলা যায়। আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, ভারতের আদর্শ তাপমাত্রা হবে একটু উঁচু মাত্রার সম্ভবত, খুব বেশি পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলো ছাড়া।

তাহলে গরম আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে আমরা নিজেদের ঠাণ্ডা রাখতে পারি? এর উত্তর কিন্তু মোটেই সহজ নয়। তবুও এ-বিষয়ে বলতে গেলে সবচেয়ে আগে বলতে হবে, সম্ভবত, উপযুক্ত পোশাক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা। যেমন, এই যে আমি বসে বসে প্রবন্ধটা লিখছি, পরে আছি শুধু সূতির একটা ফতুয়া আর ইজের। আর কিছু পরেই এখানকার অন্যান্য কর্মীদের থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্যে আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলতে হবে জবরজং পোশাকে। কি ছেলে কি মেয়ে, আমি মনে করি, এটা সামাজিক প্রথার একটা অপ্রয়োজনীয় বিধান। এই একপুরুষ আগেও দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলের মহিলারা কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অর্থাৎ শরীরের উর্ধ্বাংশ খোলা রাখতে লজ্জা পেত না। আর ইওরোপে তো মায়েরা তাদের শিশু সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে যে কোনো জায়গায়— যে কারোরই সামনে। এর জন্যে তাদের কেউ দোষারোপ করে না। ফ্রান্সেও এটা একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। এসব দেখে ওখানকার পুরুষরা কিছু মনে করে না বা শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন তোলে না। এ সব কথার মানে এই নয় যে, গরিব মানুষ আর পুরোহিতের অধিকারে ভাগ বসিয়ে একটা ধূতি বা ইজের পরে আমি কাজ করতে বা হাঁটতে চাইছি। কিন্তু আমার খানিক দুঃখ তো হয়-ই, যখন আমার পুরুষ বন্ধুরা তাদের জামা বা কুর্তার নীচে একটা সূতির গেঞ্জি চাপিয়ে নেন; বা আমার স্ত্রী গাঢ় রঙের নিশ্ছিদ্র একটা ব্লাউজের ওপর একটা স্কার্ট বা ওই ধরণের কিছু একটা চাপান। আর তাঁর ভারতীয় সহকর্মিনীদের জন্যে আমার আরও বেশি দুঃখ হয়। কারণ, তারা সারা গায়ে কয়েক পরত কাপড় জড়িয়ে রাখেন। আমি নিঃসন্দেহ যে, ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আমার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি দেখান--- তাঁর ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর মতো কালো পোশাক আর গায়ে কোনো গয়নাগাঁটি না-থাকার জন্যে।

ভারতে, প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করে না এমন একজন মানুষ, সারাদিনের মধ্যে ২৫০০ কিলো

ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে। তার মানে, ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১০০ কিলোগ্রাম জল গরমের জন্য এই তাপ ক্ষমতা যথেষ্ট। কিন্তু যদি তার এই তাপ ক্ষমতা ৫০ কিলোগ্রাম জল ফোটানোর সমান হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, যদি না কোনো ভাবে বাকি ওই বাড়তি তাপ বেরিয়ে যেতে পারে তার শরীরের তাপমাত্রা প্রতি ঘণ্টায় একটু করে বাড়বে এবং পরের দু'ঘণ্টার মধ্যে সে প্রবল জ্বলে আক্রান্ত হবে এবং তার পরের তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে সে মারা পড়বে। এছাড়াও সূর্যকিরণ থেকেও একটা বেশ ভালোরকম তাপ একজন মানুষের দেহ গ্রহণ করে। সেই তাপ থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে যদি সে তার শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বন্ধ রাখতে পারে। মনুষ্যদেহ থেকে দু'ভাবে শরীরের তাপ বেরিয়ে যায়— গরম বাতাস এবং বাষ্পীভবনের ফলে। এই শেষেরটিই এ-ব্যাপারে বেশি দক্ষ। প্রতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোক্যালরি তাপ থেকে মুক্তি পেতে একজন মানুষের দরকার ১ ডিগ্রি সে.গ্রে. উষ্ণতার ২৭০ ঘন মিটার বাতাস যেখানে শুধু ১৭০ ঘন সেন্টিমিটার বা ৪ লিটার জল বাষ্পীভবনের প্রয়োজন হয় প্রতিদিনে।

যদি মনুষ্যদেহের থেকে বাতাস যথেষ্ট ঠান্ডা হয় তাহলে এই বাতাস খানিক তাপ শুষে নেয়, এমন কি যথেষ্ট জল শোষণ করার মতো আর্দ্র বাতাসও। এখানেই একটা পাখার বা জোরালো বাতাসের ঠান্ডা করার ভূমিকা। যদি বাতাস শুষ্কও হয় তাহলেও কিন্তু বাষ্পীভবনের সাহায্যে যথেষ্ট ঠান্ডা হতে পারে। আর যদি মনুষ্যদেহ থেকে বাতাস বেশি গরম হয় তাহলে এই গরম বাতাস মানুষের শরীরকে আরও বেশি উষ্ণ করে তুলবে। কিন্তু বাতাস যদি বেশি শুষ্কও হয় তাহলেও বাষ্পীভবনের সাহায্যে তাপ অনেকটা বেরিয়ে যায় যা মানুষের শরীরকে কিছুটা ঠান্ডা রাখে। আমার বাবা, যিনি এই বিষয় নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন, তিনি একট ঘরে প্রায় ৩২ মিনিট কাটিয়েছিলেন যেখানে বাতাসের তাপমাত্রা ছিল ৮৩ ডিগ্রি সে. গ্রে. বা ১৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট, কিন্তু বাতাস যখন স্বাভাবিকরকম শুষ্ক হয়ে এল তখন তাঁর দেহের তাপমাত্রা বেড়েছিল খুব সামান্যই। একটা ওয়েট বালব থার্মোমিটারের তাপমাত্রা, অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, একটা থার্মোমিটার যার বাল্‌বটি জড়ানো আছে এক টুকরো ভিজে কাপড়ে, তা ঠান্ডা হচ্ছে বাষ্পীভবনের সাহায্যে; একজন মানুষের বেলায়ও ছিক এরকমটাই ঘটে— বাষ্পীভবনের সাহায্যে অর্থাৎ শরীর থেকে ঘাম বার করে দেওয়ার মাধ্যমে। মনুষ্যদেহের ক্ষেত্রে এর একটা বিরাট কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। যদি ওয়েট বাল্‌বের তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সে.গ্রে.-এর থেকে বেশি হয় তাহলে স্থির বাতাসে একজন মানুষের তাপজনিত কারণে অর্থাৎ heat stroke -এ মৃত্যুর ভয় থাকে। যদিও সুন্দর বায়ু প্রবাহের দিনে একজন মানুষ ৩৪ ডিগ্রি সে. গ্রে. তাপ সহ্য করতে পারে অনায়াসে। এবং যদি কেউ এইরকম তাপমাত্রায় স্বল্প পরিশ্রমের কাজ করে তাহলে তার তাপমাত্রা তিন বা চার ডিগ্রি কমে যাবে।

যখন বাতাস খুব গরম ও শুষ্ক তখন বায়ুপ্রবাহ একজন মানুষের দেহ ঠান্ডা রাখে চামড়ার সাহায্যে যতটা সম্ভব ঘাম বার করে দিয়ে। কিন্তু যদি বায়ুপ্রবাহ তাকে শুষ্ক করে তোলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তাহলে যে-কোনো রকম বাড়তি তাপ তার শরীরকে আরও উষ্ণ করে তুলতে থাকে যতক্ষণ না তার শরীর থেকে তাপ বেরোবার হার বেড়ে যায়। এবং এই কারণেই শুষ্ক গরম বাতাস বইতে থাকলে—যেমন, উত্তর ভারতে যখন লু-বয়— মানুষ ঘরের মধ্যে থাকে।

গোরু বা ঘোড়া মানুষের মতো শরীর থেকে ঘাম বার করে দিয়ে নিজেদের ঠান্ডা রাখে কিন্তু এর উল্টো উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুকুরের বেলায় তা হয় না। একটা কুকুর যখন খুব গরম বোধ করে তখন তার মুখ দিয়ে খুব লালা ঝরতে থাকে আর খুব দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে। এবং ওই মুখের লালার সাহায্যে কুকুরটি প্রচুর পরিমাণ বাষ্পীভবন ঘটায় যা তাকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্যে করে। এ-কারণে শুষ্ক গরম আবহাওয়ায় কুকুরের ক্ষেত্রে পাখার হাওয়া কোনো কাজে আসে না, যদিও তা একটি গোরুর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভালো কাজ করে। অন্যদিকে, ছোটো ছোটো পোকামাকড়ের ঘামটামের বালাই নেই। আর তাই, যদি না তারা পান করার জন্য প্রচুর জল পায় তাহলে খুব তাড়াতাড়িই মারা পড়তে পারে—একই তাপমাত্রার আর্দ্র বাতাসের তুলনায় শুষ্ক গরম বাতাসে তারা একেবারে শুকিয়ে মারা যায়। এই কারণেই গরমকালে উত্তর ভারতে পোকামাকড়ের সংখ্যা একেবারেই কমে যায়।

... আশা করি যে, ... গরমকালে ঠান্ডা থাকার ব্যাপারে ভারতেও কিছুটা গবেষণা হবে, যেমন ইংলন্ডে হয়েছে। এই ধরণের গবেষণায় প্রথম যে-বিষয়ে ভাবতে হবে, তা হলো খস্‌খস্; ভারতের এই অঞ্চলে, গরম আবহাওয়ায়। বাতাস ঠান্ডা করার জন্যে আমরা একে বলি ভিজে পরদা। এই খস্‌খস্ ঘরের মধ্যের বাতাস ঠান্ডা রাখে বাষ্পীভবনের সাহায্যে। তবে আমি নিশ্চিত যে, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় ঘর ঠান্ডা রাখার জন্যে যে বায়ুপ্রবাহ এ-কাজে ব্যবহার করা হয় তা হয় খুব ধীর গতির নয়তো খুব প্রবল। এই পদ্ধতিতে ঠান্ডা রাখার কথা বলে আমি বোধ হয় একটি নির্ভুল কাঠামোর কথা বলতে পেরেছি। কিন্তু আমার দীর্ঘ এবং কখনও কখনও তিক্ত অভিজ্ঞতায় জেনেছি, এই ধরণের বিষয়ে তত্ত্ব কখনও পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার (experiment) বিকল্প হতে পারে না। আমার মনে হয় আরও একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হলো, গরম আবহাওয়ায় শিশুদের শরীর সম্পর্কে। এমনকি ইওরোপেও বেশ ভালো সংখ্যক শিশু মারা যায় গরম আবহাওয়ায় শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যাওয়ার কারণে। আমরা এখনও জানি না একজন প্রাপ্তবয়স্কর সঙ্গে একটি শিশুর কতটা পার্থক্য বিশেষত শরীর ঠান্ডা রাখার ব্যাপারে। মেডিকেল সোসাইটির একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছিলাম—এই ধরণের গবেষণার প্রয়োজনের কথা। এবং এটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি যে, মে-মাসের গরমের দিনে উত্তর প্রদেশের মতো জায়গায় যে-তাপমাত্রায় একজন মা তার বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় বেরোয়— তা একমাত্র ভারতেই সম্ভব, ইংলন্ড বা অন্যত্র কখনই চোখে পড়বে না। খবরের কাগজের এক সাংবাদিক ভারতীয় শিশুদের ওপর পরীক্ষার কথা বলার জন্য আমায় অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু ঘটনা হলো এই যে, এই পরীক্ষা প্রতি বছরই চলছে কয়েক লক্ষ শিশুর ওপর— এবং এর ফলে মারাও যাচ্ছে বহু শিশু। কিন্তু কেউই শিশুদের শরীরে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি বা শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যাওয়ার, বা এই ধরণের বিষয়ে কোনো কার্যকর পন্থা নেয় নি। এর ফলে মারা পড়ছে ওই শিশুরাই, অকারণে; আর আগামী প্রতি বছরে এই সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। ভারতে, ঠান্ডা রাখার সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক বিষয় আছে--- যেগুলোর গবেষণা-অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য কোনো বহুমূল্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। তবুও কিন্তু কেউই এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা-গবেষণার জরুরি প্রয়োজন অনুভব করেন নি। এই ছোট্ট রচনা, গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার মোকাবিলায় অন্তত কিছু ভারতীয় নবীন বিজ্ঞানীকে উদ্বুদ্ধ করবে।□

সাপের কামড়

পুণ্যব্রত গুণ

ডাক্তারি পাশ করেছি আমি ৩০ বছর আগে। কর্ম-জীবনে যে সব জায়গায় কাজ করেছি, ঘটনাচক্রে সে সব জায়গায় সাপের কামড় প্রধান স্বাস্থ্য-সমস্যা ছিল না। জানেন আমি সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে জানি না! এবং জানেন না অধিকাংশ ডাক্তারই! ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে এমন অনেক রোগের চিকিৎসা শেখানো হয়, যে রোগের রোগী আমরা হয়তো সারাজীবনে একজনও দেখব না, অথচ আমাদের ভালো ভাবে শেখানো হয় না সাপের কামড়, জলাতঙ্ক, মৌমাছি-বোলতা-বিছের হুলের চিকিৎসা! তাই বন্ধু ডাক্তার দয়ালবন্ধু মজুমদারকে উদ্যোগ নিতে হয় সরকারি ডাক্তারদের সাপের কামড়ের চিকিৎসা শেখানোর!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বছরে ৩৫ থেকে ৫০ হাজার ভারতীয় মারা যান সাপের কামড়ে। অথচ ২০০৮-এ কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব বলে সে বছর নাকি মাত্র ১৪০০ জন সাপের কামড়ে মারা গেছিলেন! আসলে যে ৬টি রাজ্য সর্প-দংশনের সমস্যায় সবচেয়ে বেশি সংকুল, তারা তথ্যই পাঠান নি সে বছর!

২০০৫-এ ভারতে দুর্ঘটনা-জনিত মৃত্যুর ৫ শতাংশ আর সমস্ত মৃত্যুর ০.৫ শতাংশের কারণ ছিল সাপের কামড়।

প্রতি ১০ সেকেন্ডে ১ জন ভারতীয়ের শরীরে সাপ বিষ ঢেলে দেয়, আর এমন ৪ জনের মধ্যে ১ জন তার ফলে মারা যান।

মূলত গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্য-সমস্যা বলেই বোধহয় সাপের কামড় যথাযথ গুরুত্ব পায় না রাষ্ট্রের কাছে। আসলে সাপের কামড়ে আক্রান্ত কারা?

সারা দেশের সর্প-দংশন তথ্যে দেখা যায় প্রতি ১০ জন সাপের কামড়ের রোগীর মধ্যে ৯ জন গ্রামের মানুষ, ১ জন শহরের।

সর্প-দংশনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষি শ্রমিকরা এবং জীবনধারণের জন্য যাঁদের জঙ্গলে যেতে হয় এমন মানুষরা।

সাপের কামড়ের ঝুঁকি যাঁদের বেশি, তাঁরা প্রধানত দারিদ্র্য-সীমার নীচে থাকা গ্রামীণ মানুষ, স্বাস্থ্য-পরিষেবা যাঁদের জন্য অপ্রতুল।

সাপের কামড় পুরুষরা খান মহিলাদের চেয়ে বেশি।

যাঁরা সাপের কামড় খান তাঁদের বেশির ভাগ কমবয়সী, ২৫ থেকে ৪৪ বছর তাঁদের বয়স।

সাপ কামড়ায় বেশি পায়ে আর হাতে (৯০-৯৫ শতাংশ)।

সাপে কামড়ানোর পর হাসপাতালে সাধারণত থাকতে হয় ২ থেকে ৩০ দিন, গড়ে ৪ দিন।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরও ৫-১০ শতাংশ রোগী মারা যান— মৃত্যুর কারণ হঠাৎ করে হওয়া কিডনির বিকলতা, শ্বাস-প্রশ্বাসের বিকলতা, জীবাণু-সংক্রমণ, রক্ত-ক্ষরণ ইত্যাদি।

পরিবেশ-ধ্বংস ও সর্প দংশন

চাষের জমির জন্য জঙ্গল ধ্বংস করায় সাপেদের শিকার বেড়ে যায়। ধান খেতে হাজার হাজার ইঁদুর থাকে, ইঁদুরের টানে অনেক সাপ আসে। মানুষ চাষ করতে যায় রোজ সকালে, ফেরে সন্ধ্যায়— এই সময়টা সাপেদেরও সক্রিয় থাকার সময়। ফলে মানুষের সঙ্গে সাপের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সাপের সব কামড়ে মৃত্যু হয় না

সাপের কামড়ের পর চিকিৎসা না করালেও ৮০-৯০ শতাংশ মানুষ বেঁচে যান, কেননা—

১. আমাদের দেশে প্রায় ২৫০ রকম সাপ পাওয়া গেলেও তাদের ৮৫ শতাংশ নির্বিষ, যাদের না আছে বিষ-থলি না আছে বিষ-দাঁত।
২. ক্ষীণবিষ কিছু সাপ আছে, যাদের বিষের তীব্রতা এতই কম যে তাতে মৃত্যু হয় না।
৩. উগ্রবিষ সাপগুলোর মধ্যেও অনেক প্রজাতির সাপ লোকালয়ে থাকে, ফলে তাদের কামড়ের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
৪. যে সব সাপের কামড়ে আমাদের দেশে মানুষ মারা যান সেগুলো হলো— ফণাধর (গোখরো ও কেউটে), কালাজ, চন্দ্রবোড়া ও ফুরসা (ফুরসা পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় না বললেই চলে।) এসব সাপ কামড়ালেও যে মৃত্যু হবেই এমনটা বলা যায় না, কারণ— ক. বিষধর সাপের অনেক কামড়ে সাপ বিষ ঢালে না। খ. অনেক কামড়ে অল্প বিষ ঢালে।

   সাপ বিষ ঢালে তার ইচ্ছামতো। কতটা বিষ শরীরে গেছে তা সঙ্গে সঙ্গে বোঝার কোনো উপায় নেই, রোগীর উপসর্গ কি কি, এবং সেগুলো কিভাবে বাড়ছে তা দেখেই কেবল বোঝা যায়।
৫. সাপের বেশির ভাগ কামড়ে মৃত্যু হয় না এই ঘটনার সুযোগ নেন ওঝারা, জড়িবুটি, তন্ত্র-মন্ত্র, বিষ পাথর দিয়ে সাপের বিষ নামানোর অভিনয় করেন তাঁরা।
৬. **ওঝার কাছে যাওয়ার বিপদ হলো— কোন্ কামড়ে বিষ আছে তিনিও জানেন না, দংশিত ব্যক্তিও জানেন না! বিষ থেকে থাকলে কিন্তু নির্ঘাত মৃত্যু!**
৭. বিষ ক্রিয়ার উপসর্গ ও লক্ষণের জন্য তাই খেয়াল রাখতে হবে সাপের কামড়ের পর ২৪-৪৮ ঘণ্টা।

কি উপসর্গ-লক্ষণ দেখবেন?

মনে রাখা দরকার কলোজ, কেউটে ও গোখরোর বিষ কাজ করে প্রধানত স্নায়ুতন্ত্রের ওপর, অন্যদিকে চন্দ্রবোড়া ও ফুরসার বিষ কাজ করে মূলত রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতার ওপর। বিষধর সাপের

বিষক্রিয়ার লক্ষণ বুঝতে ৫টা বিষয় মনে রাখুন—

১. রক্তপাত— কামড়ের জায়গা, নাক, কাশি, বমি, পেচ্ছাপ ও পায়খানার সঙ্গে রক্তক্ষরণ।
২. রস-ক্ষরণ— কামড়ের জায়গা, পেচ্ছাপ-পায়খানার সঙ্গে জলের মতো রস-ক্ষরণ।
৩. ফোলা ও ব্যথা— ক্ষত-স্থান ফুলে ওঠা, ব্যথা।
৪. মাথা, চোখের পাতা, নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়া।
৫. মুখ থেকে ঝরতে থাকা।

প্রথম ৩টে লক্ষণ চন্দ্রবোড়া, ফুরসার কামড়েই প্রধানত দেখা যায়। শেষের লক্ষণগুলো গোখরো, কেউটে, কালাজের কামড়ে বেশি দেখা যায়।

সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা

১. রোগীকে সাহস জোগান— বলুন সব সাপের কামড়ের মধ্যে ৭০ শতাংশ নির্বিষ সাপের কামড়, আর বিষধর সাপ কামড়ালেও মাত্র ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিষ ঢালে।
২. কামড়ানোর জায়গাটা এমন ভাবে অনড় করুন যে ভাবে করা হয় হাড় ভাঙলে। স্ক্রিন্টের সঙ্গে অঙ্গটাকে বাঁধতে ব্যান্ডেজ বা চওড়া কাপড় ব্যবহার করুন, রক্তনালীতে যেন চাপ না পড়ে। দড়ি-জাতীয় কিছু দিয়ে কষে বাঁধবেন না।
৩. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যান। সাপের বিষের প্রতিষেধক ছাড়া অন্য কিছুই কিন্তু বিষ ঢুকে থাকলে কাজ করবে না।
৪. যাওয়ার পথে রোগীর যে যে উপসর্গ-লক্ষণ দেখেছেন তা ডাক্তারকে বলুন।

কি কি করবেন না

কামড়ের জায়গাটা ধুয়ে বিষ সরানোর ঝোঁক দেখা যায়। এমনটা করবেন না— দেখা গেছে ধোয়াধুয়ি করলে লসিকাতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে বিশ শরীরে বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে।

লঙ্কা, আদার রস, শেকড়-বাকড় খাওয়ানোর কোনো জায়গা নেই। কামড়ের জায়গায় ছোটো মুরগীর মলদ্বার কেটে লাগাবেন না বা বিষ পাথর লাগাবেন না।

কামড়ের জায়গা কেটে রক্ত-রস শোষণ করতে যাবেন না। তাতে চামড়ার নীচে থাকা রক্তনালী বা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া আগেই বলেছি কিছু সাপের বিষ রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সে সব ক্ষেত্রে এই কাটাকাটিতে রক্তপাত হয়ে মৃত্যু অবধি হতে পারে। এছাড়া জীবাণুসংক্রমণের ঝুঁকি তো আছেই।

বাঁধন দেবেন না। সূতো, দড়ি, ইত্যাদির কড়া বাঁধন দিয়ে বিষের ছড়িয়ে পড়া আটকানোর চেষ্টা করা হয়। এতে বিপদ অনেক। যেমন — ১. বাঁধন দেওয়া অঙ্গে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে অঙ্গহানি হতে পারে। ২. কোষ-কলার মৃত্যু হতে পারে। ৩. রক্তের জমাট বাঁধা দলা রক্তনালীতে আটকে বিপদ ঘটাতে পারে। ৩. বাঁধন খোলার পর রক্তচাপ বিপজ্জনক ভাবে কমে যেতে পারে। ৪. রোগী এক মিথ্যা ভরসা পান, তাতে হাসাপাতালে যেতে দেরি করেন...। ৫. আগে কামড়ের জায়গাটা পুড়িয়ে দেওয়ার চল ছিল। তাতে লাভ তো হয়ই না, বরং ক্ষতি হয়।

গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে ক্ষতস্থানে বরফ দেওয়ার চল ছিল। এতেও কোনো লাভ নেই, বরং এতে কোষ-কলার মৃত্যু বাড়ে।

সাপের বিষের প্রতিষেধক কামড়ের জায়গায় লাগিয়েও কোনো লাভ নেই।

১৯৮০-এর দশকে কেউ কেউ বলতে লাগলেন কামড়ের জায়গায় বৈদ্যুতিক শক দিলে নাকি বিষ নষ্ট হয়ে যায়। এমনটাও হয় না।

বিষের চলাচল কমানোর জন্য অঙ্গটাকে অনড় করা দরকার, কিন্তু তা করতে গিয়ে জোরে চাপ দেওয়া চলবে না। জোরে চাপ দিলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচনের সম্ভাবনা থাকে।

সাপের বিষের একমাত্র প্রতিষেধক অ্যান্টি-স্নেক ভেনম (এভিএস)

এভিএস সাপের বিষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়— মৃত্যু ও অসুস্থতা কমায়, জটিলতা কমায়। আমাদের দেশে যে এভিএস পাওয়া যায় তা প্রধান ৪ প্রজাতির সাপের বিষের বিরুদ্ধেই কার্যকর।

ঘোড়ার রক্ত-রস থেকে এভিএস তৈরি করা হয় বলে বিশুদ্ধিকরণের পরও কারুর কারুর এ থেকে অ্যালার্জি হতে পারে।

তরল রূপে বা পাউডার রূপে এভিএস তৈরি হতে পারে। তরল এভিএস রেফ্রিজারেটরে কোল্ড চেনে রাখতে হয়। পাউডার এভিএস সাধারণ ঠান্ডা জায়গায় রাখলে চলে, তাই দুর্গম জায়গায় যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত সে সব জায়গার জন্য পাউডার রূপই উপযোগী।

কেবলমাত্র বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলেই এভিএস লাগানো উচিত।

এভিএস শিরা দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও অ্যালার্জি হলে তা মোকাবিলার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সাপের কামড় ঠেকাতে

রাতে মজবুত জুতো পরে চলাফেরা করুন। টর্চ জ্বালিয়ে চলুন। ভারী কদম ফেলে হাঁটুন। সাপ কম্পন বুঝতে পারে, বুঝে সরে যাবে।

ঘাস-কাটা ফল বা তরিতরকারী তোলা, গাছের তলা সাফ করার সময় সঙ্গে একটা লাঠি রাখুন। আগে লাঠি দিয়ে ঘাস বা পাতা নাড়ান। সাপ থেকে থাকলে তাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিন। আগে কেটে রাখা ঘাস তোলার আগে লাঠি দিয়ে নাড়িয়ে দেখে নিন।

শস্য কাটার সময় আগে তলার জমিটা দেখে নিন।

কাঠ কুড়োনোর সময় পাতা ও কাঠিগুলোর দিকে নজর রাখুন।

পশু খাদ্য ও জঞ্জাল বাড়ির কাছে রাখবেন না। এগুলোতে ইঁদুর আসে, ইঁদুরের লোভে আসে সাপ।

মাটিতে না শোওয়া ভালো।

ঘরে দরজা-জানলার কাছে গাছপালা লাগাবেন না, গাছ বেয়ে সাপ ঘরে ঢুকতে পারে।

সরকারের কাছে দাবি তুলুন

প্রতিটি সরকারি হাসাপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেন এভিএস-এর ব্যবস্থা থাকে।

ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে যেন সর্প-দংশনের মতো প্রান্তিক মানুষদের স্বাস্থ্য-সমস্যাগুলো গুরুত্ব পায়।

ডাক্তার সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে পারেন না— এমন যেন না হয়। □

প্র কা শি ত হ য়ে ছে

দুর্বারের কুড়ি বছরের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক দলিল

ক খ ন ও জি ত ক খ ন ও হা র

স ম্পা দ না : **স্মরজিৎ জানা, মৃণালকান্তি দত্ত** দা ম : তিনশত টাকা

পাওয়া যাবে : দুর্বার প্রকাশনী, ৪৪ বলরাম দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৬-এ ও কলেজ স্ট্রিটে।

কামদুনি : গণধর্ষণ ও শাসক সম্প্রদায়

১৯৯১ থেকে ২০১৩ বিশ্বায়ন, উদার অর্থনীতির হাত ধরে ভারতে রাজনীতির লাগাম ছাড়া দুর্বৃত্তায়ন ঘটে গেছে। রাজনীতি এখন আর সমাজসেবা বলে নয়, নিজের আখের গোছানোর নীতি অর্থাৎ রাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে যত খুশি কামিয়ে নেওয়ার নীতি। এই নীতি ছাড়া রাজনীতি করছেন এরকম লোক পেতে বর্তমানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হবে। এতে করে রাজনীতির সমার্থক হয়ে গেছে দুর্নীতি।

খোলা বাজার তৈরি করেছে এক লোভের পৃথিবী। যেখানে নানা পণ্যসামগ্রীর মতো নারীও আজ পণ্য। আগামীদিনে, ইতিহাসের দাস-যুগের মতো, নারীকে খাঁচায় ভরে শপিংমলে বা বিগবাজারে যদি বিক্রি করা হয়, তাহলেও বোধ হয় বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। ভোগ্য পণ্যের বর্তমান পৃথিবীতে নারীর মৌলিক অধিকার হরণের ঘটনা দ্রুত বেড়ে চলেছে। বর্তমান ভারতে সব রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় থাকা নেতা-নেত্রীরাও প্রকারান্তরে নারীর অধিকার হরণের উৎসাহ-দাতা হয়ে উঠেছে, তাই কোনো নারীকে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনার প্রতিকার দূরে থাক বিচলিতও হয় না। বিপরীতক্রমে, ধর্ষণকারী যদি ধরা পড়ে এবং পুলিশ-প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার কবলে পড়ে, আইনের দশচক্রের ফাঁকফোকর গলে তাদের পুলিশ বা জেল হেফাজত থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে এ-দেশের রাজনীতিকরা বা রাজনৈতিক দলগুলিই। কার্যত জনরোষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচারের কথা বা শাস্তির প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি প্রায়শই ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার নামান্তরই।

ভারতীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান পার্লামেন্টে এইসব খুন ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা ধামাচাপা দেওয়া হয়, কেননা তথাকথিত 'জনপ্রতিনিধি'দের একটা বড়ো অংশই খুন, ধর্ষণ, আর্থিক অপরাধে অপরাধী। পেশীশক্তি আর টাকা-শক্তির জোরে তারা 'জনপ্রতিনিধি' হন! ভারতীয় আইন ব্যবস্থা এদের স্পর্শ করতে পারে না। ফলে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট ধর্ষক ও খুনিদের ভয় পায়। আমরা দেখি গণধর্ষণ ও খুনের পরেও অনেক পরিবার কন্যা হারানোর দুঃখে বোবা ও নীরব থাকেন। কারণ, তারা জানেন কিছুদিনের মধ্যেই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে খুনি ও ধর্ষক এলাকায় ফিরে আসবে এবং তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে; এমনকি পরিবারের অন্যান্য পুত্র-কন্যাদের জীবনেও ধর্ষণ বা মৃত্যু ডেকে আনবে। মুখ্যমন্ত্রীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। পরে সে-সব প্রতিশ্রুতি পালন করা হলো কিনা সে খোঁজ আর কেউ রাখেন না।

ব্যক্তিগত আমরাও এখন ক্রমশ সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রাণীতে পরিণত হচ্ছি, নিঃসঙ্গ ও স্বার্থপর হচ্ছি। বিশ্বায়ন আর হাইরাইজ কর্পোরেট সংস্কৃতি আমাদের পাড়া সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। বিকৃতমনস্ক ধর্ষক এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নেয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রমোটার-রাজের বাড়বাড়ন্ত। রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ক্রমশ শহরের আশেপাশের গ্রাম ও বস্তিগুলিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। শহর ঘেঁষা এই সব মানুষ ও বস্তিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনৈতিক দলের মাফিয়া-মস্তানরা। দল বা পার্টিকে মাসে মাসে মাসোহারা দিলে যা খুশি করা যায়। সারদা কাণ্ড যার জ্বলন্ত প্রমাণ। আজকাল যারা রাজনীতি করেন আমরা তাদের গলায় শুনি অপরাধ জগতের ভাষা। যারা প্রশাসনে ক্ষমতায় থাকেন তাঁরা নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাগুলিকে 'সামান্য ঘটনা' হিসেবে দেখেন। বিবেক ও মানবিক বোধ বর্জিত অদ্ভুত যুক্তি হাজির করেন 'প্রাচীনকাল থেকেই তো সমাজে ধর্ষণ আছে' অতএব মানব সভ্যতার অগ্রগতির এই একুশ শতকে ধর্ষণ থাকলে কি আর করা যাবে! অনেক রাজনীতিক তো আবার মেয়েদের পোশাক-আশাক, চাল-চলন, ক্রিম-পাউডার মাখা দেখলেই বুঝতে পারেন, মেয়েটি ধর্ষিতা হওয়ার জন্যেই পথে বেরিয়েছে! আর সবচেয়ে যা আশ্চর্যের তা হলো এ ধরণের মন্তব্য বেশি বেশি করে নারী-রাজনীতিকদের মুখে শোনা যায়! ফলে ধর্ষক ও খুনিরা এসব মন্তব্যে উৎসাহ পায়, নারীকে তারা মনে করে এক পেগ মদ খাওয়ার মতো সামান্য ব্যাপার! মুস্কিল হয় শাসকরা যখন গণ ধর্ষণ ও খুনকে আড়াল করার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির করেন। খুনি ও ধর্ষকদের প্রশ্রয় ও অভয় দেন। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নই ভারতীয় নারীদের নিরাপত্তার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বিপদ— আরও বড়ো বিপদ ভোট রাজনীতি। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করেন। অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আবার এমন সব মন্তব্য করেন : আগের আমলে এত এত গণধর্ষণ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ বিষয়টিকে তারা লঘু করে দিতে চান। যেন আগের আমলে এত ধর্ষণ হয়েছে, আমাদের আমলে তো তত হয়নি! এ-সবই শেষ পর্যন্ত নারীকে মানুষ বলে না-ভাবার মানসিকতা।

বর্তমানে সবচেয়ে যেটা ভয়ের রাজনীতিকদের বা রাজনৈতিকদলগুলির দাবাখেলায় কামদুনি না বোড়ে হয়ে যায়। বোড়ে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ; বিশেষত ১৫ দিনেও যখন ধর্ষক ও খুনিদের চার্জশিট দেওয়া হলো না। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি তারই প্রশাসন রাখল না। সাধারণ মানুষও বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকেও কথার কথাই ভাবেন। কারণ বিগত দু'বছরে মানুষকে তিনি কয়েকলক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি এক স্বপ্নের জগতে বাস করেন। তাঁর যাদু বাস্তবের জগতে তিনি যা ভাবেন

বা বলেন তা মুহূর্তে যাদু স্পর্শে হয়ে যায়! সাধারণ মানুষ শুধু বুঝতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রীর দোষ নেই, নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া ভারতীয় রাজনীতির দস্তুর: যত খুশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাও, সে সব প্রতিশ্রুতি রাখা হলো কিনা তা নিয়ে জনসাধারণ মাথা ঘামানোর আগে আরও প্রতিশ্রুতি দাও ...। প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে কাজে পরিণত করার সম্পর্কটিকে গুলিয়ে দেওয়ার এটাই সবচেয়ে সহজতম পন্থা। রাজনীতিকরা জানে এ ভাবেই ক্ষমতায় থাকতে হয়।

কামদুনি রাজনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে, শাসকের রক্ত চোখ উপেক্ষা করে, সাহসে বুক বেঁধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে... কিন্তু আশঙ্কা হয় কিছু দিনের মধ্যেই এটিও আরও দশটা গণধর্ষণের ঘটনার পেছনে চলে যাবে; তারপর এক সময় সংবাদ, মিডিয়া ও জনমানস থেকে হারিয়ে যাবে। দিল্লিতে বাসে ধর্ষিতা কন্যাটির মতো কামদুনিতেও এক কলেজ ছাত্রীকে নৃশংস ও বীভৎস গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে! সবচেয়ে যা নারকীয়, সংজ্ঞা হারানো অবস্থাতেই তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং পিশাচদের মতো উল্লাসে তার দুটো পা দু'দিকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে!.. তারপর জলাজমিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ...।

ভারতীয় রাজনীতিতে আমরা দেখছি শাসকরা বিরোধীদলে থাকলে একরকম মুখোশ পরে থাকেন শাসক হলে আরেক রকম মুখোশ পরে নেন। খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, দুর্বৃত্তায়ন আড়াল করার মতোই এদের প্রকৃত মুখ আড়ালে থাকে। কলকাতার পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি, গাইঘাটা, নলহাটি, রানিতলায় একের পর এক ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটল, কিন্তু প্রশাসকরা খুনি ও ধর্ষকদের ক্রমাগতই আড়ালে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি— নিষ্ঠুর, অমানবিক, বীভৎস-নারকীয় ঘটনাগুলিকে তাঁরা 'সামান্য ঘটনা' আখ্যা দিলেন (মনে করুন রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটির কথা)। শাসক দলের নেতা -নেত্রীরা এমন সব অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে ফেললেন, এমন ঔদ্ধত্য দেখালেন যা নাগরিক সমাজকে ক্রুদ্ধ করল। তাঁদের মৌন ক্রোধের ও প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটল কলকাতার রাজপথে। শাসকদলের ঔদ্ধত্য মানুষ পছন্দ করলেন না। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতায় যখনই যে দল যাচ্ছে তারাই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে! সমাজ-তত্ত্বের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে তাহলে এটি!

শাসকের রক্ত চোখের পরোয়া করেনি কামদুনি গ্রাম ও তার দুটি সরল সাদাসিধে কন্যা টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর চোখে চোখ রেখে তারা কথা বলছে। কামদুনি গ্রমে আলো, রাস্তা পানীয় জল, স্কুল আর মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আলোচনা করতে চেয়েছিল। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে নিয়েই তারা কথা বলতে চেয়েছিল। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী তাদের শুধু 'চোপ' বললেন না, তাদের গায়ে 'সিপিএম' ও 'মাওবাদী' তকমা এঁটে দিলেন। শাসকদের কাছে মাওবাদ একটি মহাঅস্ত্র যা দিয়ে সহজেই মানুষকে চুপ করিয়ে দেওয়া যায়। সিপিআইএম-ও এক সময় সর্বত্রই মাওবাদী ভূত দেখেছিল— তারা ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তৃণমূল নেত্রীও সর্বত্র মাওবাদী ভূত দেখছেন— তাহলে তাঁরও পায়ের তলার মাটি কি সরে যাচ্ছে! টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল 'মাওবাদী' হলে একসময় মুখ্যমন্ত্রী তো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজকেও 'মাওবাদী' বলে বসবেন!...

কামদুনি নিয়ে সাধারণ নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়ার পরও শাসক ও প্রশাসকদের চোখ যদি না খোলে, তাহলে ইতিমধ্যেই পর পর দু'বছর নারী নির্যাতন ও ধর্ষণে প্রথম স্থান অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যতেও প্রথম স্থানেই থাকবে। শাসকরা সব সময়েই চেষ্টা করেন ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে, সাধারণ মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে, পুরস্কার ও উপাধি দেওয়ার নাম করে একদল বুদ্ধিজীবীর গলায় বকলশ লাগিয়ে তাদের পোষ মানিয়ে রাখতে। তারা যাতে শাসকের কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে। এ ভাবে আগে যারা সরকার ক্ষমতায় ছিলেন জনসাধারণকে শাসন করছিলেন, বর্তমান সরকারও সেই একই পথের পথিক হয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় অল্প বলে তাদের বকলশ পরানো সহজ, কিন্তু সাধারণ জনমানুষকে?

গণধর্ষণ বর্তমানে অব্যাহত গতিতে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে মনে হয়, যদি না এই মুহূর্তে কোনো বড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এবং যে লোভের পৃথিবী তৈরি হয়েছে সেখানে গণধর্ষণ আরো বাড়লেও, কোনো রাজনৈতিক দলই নারীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে না কিন্তু মিথ্যা-প্রতিশ্রুতি দেবে। সাধারণ মানুষজনকেই তাই এর প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে, নচেৎ আগামী পৃথিবী আমাদের ক্ষমা করবে না। ধন্যবাদন্তে —

বিপ্লব মাজী
পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১ ১০১

A WELL WISHER